শূন্যের উদ্যান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ঃ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মোনজ বিশ্বাস

মুদ্রক :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১১, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

'রা-স্বা'

শ্রীবিমল কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গেরো !) শালার মিছিল।

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সীটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা-পরা মোটা-সোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের নিজের গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনই প্রাইভেট গলিপথ—সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল—তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার—

—দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়ো কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলেজ স্ট্রীট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যাম-বাজারের পাঁচমাথা পেরোয় নি।

—কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার—

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দীতে বলে—তব ক্যা করুঁ! উড়কে যাঁউ!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরো নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রীটে এখন গায়ে গায়ে গাড়ি জমে আছে। ভিড়ের মধ্যে দ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে

গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

—এই প্রাইভেট। গৌরহরি চেঁচাল—এটা কী হচ্ছে অ্যা! এটা কি ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার ইংলিশ স্কুল সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত। আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইংলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছয় নি গৌরহরি। পর পর দুবছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা। এখনো উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝমঝম একটা শব্দ হয়। পাগল পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দুখানা নূপুর-পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিম্‌ঝিম্ শব্দ হতে থাকত। তখন গৌরহরি প্রায়ই সেই শব্দে সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত, চোখের সামনের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠত এক শূন্যতার দৃশ্য। আর কেবল সেই শব্দ আর শব্দ। রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ —দুখানা নাচের পা ঘুরছে, উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম দিয়েছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাইসাইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—এরকম সঙ্কল্প ছিল তাঁর। বড় দুই ছেলে সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরিশ ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেসালিস্ট—কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক

গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অবশেষে স্কুল ছাড়িয়ে গৌরহরিকে অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু আধটু। পড়ার কোনো চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল—সারিয়ে দিতে পারি, তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কিসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য সে দুটো একেবারে অকেজো নয়। একটু কমজোরি. এই যা। নইলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালো চশমা-পরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম্ হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। একটু পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পিঁ পিঁ করে অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল—দেখছেন তো গাড্ডা! ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। এ জট্ ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে!

ছেলেটা চশমা-জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টাল-মাটাল। বলল—নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়—

—তাই করুন।

—মিছিলটা কি খুব বড় মনে হচ্ছে?

গৌরহরি হাসে—ভুখা মানুষ, বেকার মানুষ সমস্ত দেশে ভর্তি। মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কিনা।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল—ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরো মাইল খানেক আছে বোধহয়। এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে—মিছিল ক্রস করতে পারবেন তো!

—বলে কয়ে চলে যাবো। আমার বড় জরুরী দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে?

—তাই দেয়? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—তাহলে?

গৌর হাসে—লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু-একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পাল্টে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক্ করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ঐ হচ্ছে কায়দা—

ছেলেটা চলে গেল। ঐ রকম গোল চশমা-পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এযুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত-পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশীদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদেরও শালা-শোরের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে একেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনো কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয় নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময়ে বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন কলকাতায়। তখনো দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরে নি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তাঁর সহায় সম্বল। বগলাপতি

একা একাই অতবড় ব্যবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বৌ আর আধা-ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালীগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুর রিফিউজি কলোনীতে। সে সময়ে খবর এল, তাঁর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ঙ্কর ভেঙে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ. কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে। বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বেশী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে তিনি আরো আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ-ফিনিশ। চলে ফেরে, খায়-দায় কথা বলে—কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন—বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল—তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে. সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিপাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্ট টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝমঝম করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—কী করবি গৌরা। কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার

মাত্র দু'একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখার, আর সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগহীন হাল্কা দিন-কাটানো। কোনো কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত—আমি ব্যাটা হাফ-ফিনিশ, ফিফ্‌টি পারসেণ্ট মানুষ—আমি শালা কী করবো?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যবসা ছিল নানারকম জটিল কুটিল পথে, সেগুলো বোঝবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন—যাঃ শুয়োরের বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারী শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতিমাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই। অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারী কর।

পুরোনো একখানা ডজ্‌ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাতো হরিপদ। রোগা-টোগা ভালমানুস ছেলেটা। হাফ-ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল —গাড়ির যে অনেক ব্যাপার রে, ক্লাচ্‌ ব্রেক, অ্যাক্‌সেলেটার, গীয়ার, স্টিয়ারিং—তুই সব সামলাতে পারবি?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল—তা আমি কী করব? আমি কি চেয়েছি শিখতে? বগলু ছাড়ছে না যে!

আড়ালে আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা গৌরা পুরোনো আমলের ডজ্‌ গাড়িতে ভালমানুষ হরিপদর পাশে বসে ভোরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তায় ঘাটে।

আরে বাঃ! প্রথম দিনেই ভাল লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল না তো! কিংবা হয়তো জটিলই, কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার 'পারব না' বলে মনে হল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়—দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখোশুখো হাত-পা আর মগজের ঝম্‌ঝম্ নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল তাকে। একমাসে সে গড় গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সীটে বসে তার কাণ্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন—আরে বাপ্পোৎ, খুব শিখেছে তো! অ্যাঁ! আরে বাঃ। এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে! ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয়! অ্যাঁ! এ যে দিব্যি স্পীডও মারছে!

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাসচারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল—ছোটোবাবু, তুমি মাইরি একনম্বরের টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তোমার মতো হাফ-ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনোকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কি শেখাতুম! ঠিক গোলেমেলে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাস হীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি। ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারী বিজনেস্। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরা কি কারো সার্ভেন্ট্? ইজ্ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার

কপালখানা—কেমন গড়ানে—মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দুখানা কান—দুটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো, ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ্য করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু'একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজী শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি! ডানদিকের ঐ শালা প্রাইভেটটা! কালো চশমা-পরা লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচ্ছে। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে—খিদে তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হলগে টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা—খিদে তেষ্টা সইতে নারে-ছা-রা-রা-রা-রা-রা —গুন্‌গুন্ করে গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের—আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখ্‌খা পার্টির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই।

একটা টেরিলিন পরা লোক জানালায় ঝুঁকে বলল—গাড়ি যাবে নাকি?

—কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

—মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিসের গাড়ি দেখা যাচ্ছে—ঐ তো শেষ—

—গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয় নি—

লোকটা একটু শ্বাস ফেলে বলে—আপনি মালিক আপনার দয়া—বলে সরে গেল।

মালিক! আলবৎ মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয় নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে! কে না জানে বিশ্বসংসারে, যে, বিকেল সাড়ে চারটের চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিঙের ওপর মাথা ঝুঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাবু, ওঠো, অমন হেঁদিয়ে পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো—চোখ মেলে তাকাও তো বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে দেবে, আর ধরবে এসে পুলিশবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি! জেগে থাকো হে বগলার ছাওয়াল—

তবু শালার ঘুম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া—গৌরের চা আরো কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচা লঙ্কার কুঁচি মেশানো রগরগে গরম অমলেট, আর টোস্ট্। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড্ লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে—খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাঁউরুটিতে চর্বি, আর শুকনো চোতরা পাতার ক্বাথ দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে। খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া—

তারপর রুমালে মুখ মুছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে—না রে মরবি না। তোর ঠাকুদ্দা খেত মুক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দূর, তোরা রুপোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বিস্তর সোনারুপো মুক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরা পাতার ক্বাথ, কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজ্মে দে শালা, সব হজ্মে দে—যা খাবি সব হজ্মে দিয়ে বসে থাকবি—কেউ যদি এসে 'বাতাপী' বলে ডাক দেয়—ঘাবড়াবার কিছু নেই, বাতাপী আর বেরোবে না—

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে পুলিসের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লীয়ার। স্টার্ট্, গৌরবাবু। মাথাটা সত্যিই ঘুমে ভরে আসছে। ঘুম যেন ঠিক জলের মতো—টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো-টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক পুলিসটা বুড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনো বা হঠাৎ গৌর আচম্কা ব্রেক চেপে ধরে বলে—আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায় খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনো বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙীন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরা-পাতার কাথ নাহলে—ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন? কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে—প্রায়ই বিকেলের দিকে ঐ অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার! আর এলেই—পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

—ও বাবা পুলুশ, ও পুলশবাবা—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে—হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা। হাতটা একটু নামাও। আমরাও তো যাবো বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনো চা খায় নি—তার যে টিফিনটাইম—রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিস—

অবশেষে ট্রাফিক পুলিস হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্ত খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুশ, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগায় সিন্নি বাবার গির্জেয় মোমবাতি—এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

—এই ট্যাক্সি!

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেণ্ট্।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল-ওলা সার্জেণ্টটা এগিয়ে আসে। খামোখা হাত বাড়িয়ে বলে—লাইসেন্স্ দেখি।

এসব ফাল্তু বদমাইশী।

—কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেণ্টটা ধমক দেয়—বদমাইশীর আর জায়গা পান না! শীগগীর ঐ লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য—শীগগীর খুলুন—

খুলছি পুলুশবাবা, খুলছি। কিন্তু আমার যে টিফিন হয় নি। মিছিলের হুজুতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম—গৌরবাবু যে হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলশ! গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেণ্টকে বলে—ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন—আচ্ছা চলি—

সার্জেণ্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় ঝুঁকে গৌরকে বলে—ঠিকমতো নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়—আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি—

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—শালার পুলুশ যেন না ছোঁয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলুশবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো থালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে চৌরাস্তায়, রঙীন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো

উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখো খাড়া হয়ে—গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা—

—কোথায় যাবেন ?

—পি. জি.। বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—তবু ভাল—দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরো দূরে কোনো গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরিকে—বগলুর পোলা গৌরাকে—

রাস্তাগুলো এমন সব জলে ডোবা—আবছা আবছা—রঙীন রঙীন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গীর ট্র্যাফিক—পুলিস আড়বাঁশীতে পুরবী ধরেছে—ছুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা—চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি—গৌর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে ? ওঃ হ্যাঁ, পি. জি. ! পিছনের সীটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতো ? বুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী ! কখন আছে, কখন নেই। সার্জেণ্ট্টা নম্বর টুকে রেখেছে—

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—আপনি ঠিক আছেন তো স্যার ! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো !

—অসুবিধে ! বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—কিসের অসুবিধে !

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কিসের ! ল্যাণ্ডমাস্টারের গভীর গদী। চারদিকে শরতের রোদ মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গীর মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি—তবে আর অসুবিধে কিসের। অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন, যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না—কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম।

সে একটু আমতা আমতা করে বলে—অসুবিধে আর কি !

আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে। এই বয়সে বুঝলেন, যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে—

—কি রকম !

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে—এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝ রাস্তায় ডাইরেক্‌শন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে। থ্রম্বসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল—তাই বলছিলুম কোনো অসুবিধে ফিল্ করলে বলবেন—

পিঁ—পিঁ—প্যাঁ—প্যাঁ গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলুশ-বাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে ট্র্যাফিকের আলো। চলো হে বগলাপতির ব্যাটা—পি. জি.। মনে থাকে যেন সার্জেণ্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে—

—কোথায় যেন যাবেন স্যার !

—বললাম যে পি. জি. !

আই। ঠিক। পি. জি.। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনো গৌরহরি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে ! প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভুত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সীটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝে মধ্যে অনেক রাতে নাইটশোর ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে দেশলাই জ্বেলে খুঁজে দেখেছে। খুঁজেছে পিছনের সীটে, মেঝেয়। কোথাও কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে কি নিশুত রাত্রে গাড়ি চালাতে

চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা মৃত লোক বসে আছে পিছনের সীটে ঘাড় লটকে—লট্‌পট্‌ করছে ড্রাইনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ বুটে হাত পা বাঁধা 'ডেডবডি'। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে পিছনের সীট। গাড়ি থামিয়ে খুঁজে এসেছে লাগেজ বুট।

তাই গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে গৌর। বুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। খুব বুড়ো নয় লোকটা—তবু মরার কি কোনো বয়স আছে? মরলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে—পি. জি.-তে কী ব্যাপার স্যার! কারো অসুখ?

—আমার মেয়ে—ডেলিভারী কেস—

—বাঃ বাঃ। কী হল! নাতি না নাতনী।

—হয় নি। আজ কালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে—

—আজকালকার বাচ্চা তো! জন্মের আগে থেকেই জ্বালাতে শুরু করে, শেষ জীবন তক্‌ জ্বালায়—

আসলে এসব কথার কোনো মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ বুড়ো মানুষটা যদি হঠাৎ টেঁসে যায় স্ট্রোক ফোক্‌ হয়ে—আর সে হয়তো টেরও পেল না ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা—তাই কথায় কথায় সে বুড়ো মানুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছে থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনো অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যে। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ঐ মৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন হাজারে, কিনল বগলুর পোলা গৌরা—

ডজ্‌টা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শ টাকায় সোফার রাখলেন! গৌর আপত্তি করল—হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার—

—শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ। আচ্ছা যা, একশ পঁচাত্তর পাবি. তার বেশী কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা।

গৌর একশ পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ঘরদোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত—এ রকম কাণ্ড জন্মে শুনি নি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে!

বাবা বগলাপতি বলত—তবু ও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় গেলে কী কাণ্ড যে হত!

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন—তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস্ রে! অ্যাঁ। বেশ তো হাত তোর! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ। পাকা হয়ে গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস্। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সীটে বসে বাবা বিস্তর টাকা পয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছা গোছা নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার-পোর্টমান্টোতে। খুশী হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে

গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসত। একটু টেরছা হাসিটি, চোখ দুটি মিট্‌মিট্ করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে যেতেন। বলতেন—এ সবই তো তোদের জন্য। বড়টা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেখে যেতে পারি—

গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর বগলাপতি তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সীমেণ্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই! গভর্নমেণ্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যবসা জানতেন হাতের উল্টোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখদর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়ীজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তাঁর। একবার ইচ্ছে করেই একটা মালের টেণ্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপন-মনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপন-মনে বলতেন—বুঝলি গৌর, মালটা বছরখানেকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে। গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেণ্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে—পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায়! মাল কোথায়! লোকটা যখন পাগল পাগল ঠিক সেই সময়ে বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন—আছে, মাল আছে। তবে লোকসানে তো দিতে পারি না। এই আমার রেট—বলে রেট দেখালেন। লোকটা ডজ্

গাড়ির পিছনের সীটে বসে বগলাপতির পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেণ্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবো। বগলাপতি হাসেন—তবু তো জেল থেকে বাঁচবে! অবশেষে বগলাপতি রেট কমিয়েছিলেন। লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সীটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা)—বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যবসা চলে?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা সে খুব ভাল চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দি কাশি, একটু ফাঁস্ শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে উপুড় হয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াতো, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু, বগলাপতি দূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় এধারে ওধারে কাত করে পুরোনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ। প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করত গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে-কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ গাড়িখানার যত চমক ঠমক ততটাই তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরোনো ডজ্খানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠছিল। সে যখন গাড়ি চালাত তখন মন প্রাণ দিয়ে। কোনোদিন তার হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায় নি। স্টিয়ারিঙে বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহরি না গাড়ি তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা—।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেন্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চলাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই-ব্লাডপ্রেশার। সহায় সম্বল বলতে হাফ-ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফালতু কিছুদিন বিলেতে থেকে দেওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফুর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাতো। সে নিজেও ফুর্তি লুটেছিল। তাই রেখে ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখিত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেন্টের স্টোরিং এজেন্সী পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে—ফাদার সিক্, কাম শার্প।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট শিখেছে কয়েকবছর। পাস করে নি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসলে জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং ছোটোখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভী ব্লু স্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যাণ্ড কি 'মোকাম্বোর পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প-কদিনই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাখোহরির যোগা-যোগটা ছিল মিনিস্টার আর সেক্রেটারীদের লেভেল-এ। অল্প কয়েকদিনেই সে এজেন্সীর ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল।

তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ কারবার সেইসব ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত, রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমলে দেখা দিল উল্টে তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলীর। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত, বাবা এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজকারবার, এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারীর বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরেফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোটো মানুষ সব, তোমাকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট্ বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিঙে বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার দারোগা সবাই হাঁ করে দেখছে। সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং-এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নামে রিপোর্টও যায়। কিন্তু তা সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতা-রাতি উন্নতি দেখে তিনি ভেঙে পড়েন, আর বলেন, বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির করা দরকার। ইনস্পেক্টরকেও পান-তামাক দিতে হয়—আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে-আপদে এরা যে কত কাজে আসে—

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কণ্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারী। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ্ গাড়িটার বশংবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে

উন্নতি ভাল বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বোর ভিতরে স্বপ্ন-আলোয় নাচে গায়, গ্র্যাণ্ডে পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ্ গাড়িখানা বার বার মুছ্ছে আর মুছ্ছে। ঐ তার আনন্দ, সুখ, সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যবসাপত্রের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা তার মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলাপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন—বড়গাছে নৌকো বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডোবায়—তুই কেন মরবি। তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই রাতে আমার ঘুম নেই।

পি. জি.তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল বুড়ো লোকটাকে। লোকটা খুবই সাবধানী। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুল পকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে টায়ে তাই দিল, খুচরো ফেরতের কোনো ঝামেলা রাখল না। এক্জ্যাক্ট্ ফেয়ার। বাহাঃ রে বাহাঃ।

—স্যার, ঐ সার্জেণ্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পৌঁছে দিয়েছি আপনাকে! দিই নি!

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—সার্জেণ্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয়

হয় আর কি! নম্বর ঠুকেছে তো আমি কী করবো? তোমাদের বদমাইশী কে না জানে? দেয় যদি ঠুকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না, আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও—গভর্ণমেণ্টের পুষ্যিপুত্তুর সব—

বুড়োটা বক্‌বক্ করতে করতে কাটল।

শালা! গৌরবাবুর টিফিন-টাইম হড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ঐ সার্জেণ্ট্ না ধরলে গৌরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী করতে বাবা বুড়ো-মাল!

বিড়বিড় করতে করতে গৌরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে—এই যে, এই ট্যাক্সি!

আর না বাবা। আর না। এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গৌরহরির নামই গৌরহরি নয়। কারো সার্জেণ্ট নাকি বগলাপতির ছেলে? অ্যা! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সে তো বুঝতেই পারছি। মাসের প্রথম দিকটা তো—জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারো পয়সার কেনা চাকর নই। এই ল্যাণ্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ্ গাড়িটার মতো। হ্যাঁ, আলবৎ, লাল কাপড়ে মিটার ঢাকার পর এখন এটা আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারী। গৌরবাবুর টি-পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর-বদর। দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—বাবা পুলুশে যেন আর না ধরে। পুলুশে ধরলে আঠারো ঘা।···অই ত্থাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে। কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখ। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে

দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল-পুলিশ। লাল নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু'একটা এসে ধীরে ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি. জি. হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে—এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশী চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে—পালিও না—নম্বর টোকা আছে, সাবধান—

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্ শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে, নাঃ, রসা রোড রসারোডের মতোই দেখাচ্ছে আবার। কেবল ঐ রঙীন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইণ্ড্ স্ক্রীনটা, ঐ তো পুলিসটার কাঁধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রীন লাইট। চলো হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যাণ্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিঙ মেশানো চোতরা পাতার ক্বাথ না হলে আর এখন গৌরবাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বডি পড়ে যাবে।

গৌর ওড়ে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ' ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভাল লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাঁহাতক ভাল লাগে রোজ। মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভাল! গৌর খুশীতে শিস দেয়। তার গাড়ি উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে দেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সীটটা নজরে রাখে। শালার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সবসময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং-এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনো হুজ্জতে গাড়িটার গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময়ে বসে আছে পিছনের

সীটে। নয়তো নড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি তো নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই না পরি! আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা গৌরা—। আমি শালা কার সার্ভেন্ট! লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ্, আমি গৌরা—নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাবো। তুই মরা মানুষ—মরা মানুষের মতো থাকবি—নো ইন্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস্। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস—এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনো ভয় দেখিয়েছিস্—

ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপ্স্—। ফুটপাথে রঙ বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা হাত ওঠায়। মোড়ে লাল বাতিতে দাঁড়িয়েছো কি—যেতে চাও বা না চাও—দরজা লক্ করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে—বড় দরকার দাদা, একটু কাইণ্ড হয়ে নিয়ে যান—বাড়তি পয়সা দেবো—দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক্ করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যাবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলুশে তবে অন্য কথা। পুলিসকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন ডরাতো তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয় ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনোকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়াতে লাগল, ইনস্পেক্টরদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত

রাখোহরি। পুরোনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত—তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন—ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর মামাবাড়ির ধাত। আমার শ্বশুর বাড়িটার ঐ দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না—

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দূরের খুঁটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি-চামারি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিওগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ্ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবারে উত্তর বাঙলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেন্টদের খুব রবরবা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেন্ট-দের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং-এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার একটা হিসাব ধরে শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইনসঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যাণ্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরোনো ডজ্ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ-পোষাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরোনো ব্যবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং-এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যাণ্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথম দিককার মডেল, খুব চালু গাড়ি। বগলাপতি ন' হাজারে কিনলেন গাড়িখানা। গৌরকে ডেকে বললেন—বুঝলি গৌরা, তোকে যা

দেবো ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবোই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো বা, যদি ভাগ্যে থাকে। রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুণে গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ঐ রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভাল, থাকবি আনন্দে, খেয়ে পরে। খুব বেশী লোভ-টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা-হলুদ রঙ করে, সীট-টীট পাল্টে, মেরামত করে, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল সিন্দুর ঠেকিয়ে, লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি হয়ে রাস্তায় বেরোলো। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন—ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছো। এতদিন ছিল ড্রাইভার তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যাক্সিওয়ালা!

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে দিতে পারবে। ভাইদের হাতে তোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর-বাকর হয়ে যেত। বাপ মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যানঘ্যান্ করতে লাগলেন—তা দিলেই যদি তবে নতুন আর ভাল গাড়ি দিলে না একখানা। বিশ ত্রিশ হাজার টাকার দামী গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম।

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন—সামনে বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বৌ! সেই দুর্দিনে একখানা দামী গাড়ি যদি গৌরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো বা।

তো নতুন ল্যাণ্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গৌরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চালু, পচা মাল দিয়ে ওকে ঠকাই নি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবে-চিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইব্‌লিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভাল। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিসও নয় নর্থের মতো টিকরমবাজ। গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মিটার খুললেই ট্যাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধার ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট—রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরের সেই কামানখানা এখনও লাল নীল হলুদ বল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে বাতাসে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস্ করে। ঠিক থাকো গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দূরেই দাশ কেবিন। এই তো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু, আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল—

পিছনের সীটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনো ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ঐ শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবডিটাকে দেখা যায় না কখনো। কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারী শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাঁকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি!

শালা ডাকটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা! কিন্তু ঐ একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাক্‌ল্ করা যায়, যতই জাঁহাবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্যি ল্যাণ্ডমাস্টারখানা বিনি-পয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোর টুয়েন্টি কোথাকার!

বিস্তর হাত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যাণ্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে—ট্যাক্সি—ই—ই—

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশে পাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে —আর একটু বাবা গৌর, আর একটু—শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা, যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ঐ ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনো সোয়ারী নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম—

ফাদার ফ্রান্সিস্ যখন খেলা শেখাত তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ঘেরা মাঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত—হে গৌরঅরি, ফ্যাস্ দি বল্।

গৌর চেঁচিয়ে বলত—পাস দি বল—

সে ফ্যাস্ ফ্যাস্—নট্ পাস—

গৌর হেসে কুটিপাটি—ফ্যাস্-ফ্যাস্—আই ওনট্ ফ্যাস্ দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস্—

—ডুষ্টু চেলে গৌরঅরি—অ্যাও, বালো ওবে না—

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেই সব রঙীন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন—এই গৌরঅরি, ফ্যাস্ ইট—ফ্যাস্ ইট্—

—আই ফাদার—গৌরহরি বিড়বিড় করে—আই উড লাইক টু ফাস্ ইট ফাদার—আই উড ভেরী মাচ লাইক টু—

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তাঁর সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা।

উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে। গৌরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গৌর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার—গৌরঅরি—অ্যাও গৌরঅরি—গুড ফর নাথিং—

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং শব্দ করে। গৌরহরি চমকে ওঠে। চমকায় পিছনের সীটের সেই ডেডবডি।

গৌরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে —যাবেন দাদা! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—

—দেখছেন তো মিটার ঢাকা রয়েছে—

—একটু দয়া করুন—

দয়া! কিসের দয়া! কোন্ পুলুশটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে! কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট! কোন্ সোয়ারী কথা না শুনিয়ে ছাড়ে! অ্যা! পুলুশ ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরো তখন! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি? এটা গৌরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিনে কি পোঁছোনো যাবে শেষ পর্যন্ত? কে জানে! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গৌরহরির। এখনো মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি। বাবা লালবাতি, গৌর যে আর পারে না—বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল—। দাশ কেবিনের সেই চোতরা পাতার ঘন ক্বাথ্টি—যার নাম কিনা চা—সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে-নাড়া হয়ে যাচ্ছে—আমে দুধে মিশে যাচ্ছে বাবা—

মচ্ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

—চোপ্‌। বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা—বিনিপয়সার পার্মানেণ্ট সোয়ারী! হাফ-ফিনিশ ফিফ্‌টি পারসেন্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রীন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোলো গৌর তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতরে এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা শুখো আর একটা ভাল পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনোদিনই কারও সার্ভেন্ট নয়। ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যাণ্ডমাস্টার—মিটারে লাল কাপড় জড়ানো প্রাইভেট। গৌর যখন খুশী খুলবে কাপড়, যখন খুশী প্রাইভেটকে ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোনো শালার কিছু বলার নেই। এখন দাশ কেবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিস্‌গিস্‌ করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল-ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশী শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা—কোনো শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সীটা যখন ফুলে ফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী—রাখোহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয় নি। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে

বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পাল্টে গেছে মিনিস্টার। নতুন করে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে রুই-কাৎলা ধরো। যাদের চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে রাখোহরি, তখন তাদের জো। তারা ওঁৎ পেতেই ছিল। কোনো গুদামেই মাপ মতো মাল থাকে না। এ কথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান-তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান-তামাকের বন্দোবস্ত তখনো করে উঠতে পারে নি রাখোহরি। উত্তর বাংলার গদিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইনস্পেক্টর আর দারোগা তার ছুটো গুদাম দিল সীল করে! রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মাথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারী রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারেন নি। একা একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে রাখোহরি। অবশেষে বেগতিক দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে—বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইনস্পেক্টর নয়, অন্য ব্যবসায়ীরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসী। বিলেতে ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি মূলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবু বগলাপতি শেষ চেষ্টা করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নালী ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে তখন। পাবলিক গেছে ক্ষেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের ছুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালোবাজার। দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রুতা! তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকতে সীল করা গুদামের টিন লোক লাগিয়ে রাতারাতি ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি—ছুজনকেই পুলিসে ধরল। বালীগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ-ফিনিশ গৌরা।

গৌরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গৌরা সকালে ল্যাণ্ডমাস্টার নিয়ে বেরোয়। সারাদিন কলকাতার সোয়ারী এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে এসে মায়ের কোঁচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়—ও আমার গৌরা। শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, এ কথা কে ভেবেছিল বাপ আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক্ টিক্ করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি!

ধীরে সুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে—আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাবো।

—গঙ্গার ঘাট! মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালই লাগবে গৌরের।

—চলুন। বলে সে লক্ খুলে দেয়।

ছেলেমেয়েদুটো কল্‌কল্ করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথায় মাঝখানে মাঝখানে একটু আধটু ফিস্‌ফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে—লোকটার একটা হাত দেখেছো। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে—একটা পাও তাই।

—ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাক্সিডেন্ট করবে না তো!

—দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা; বগলুর পোলা গৌরা—হাফ-ফিনিশ ফিফ্‌টি পারসেন্ট ছা-রা-রা-রা-রা—

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তার চেহারা রোঁয়া ওঠা কাকের বাচ্চার মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া ঢুল্ ঢুল্ করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ্

গাড়িটা ছ'হাজারে বিক্রি করেছে রাখোহরি। কেস্ চলতে লাগল। সে কী চলা। তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। কেস্ চলে তো চলেই। সেই কেস্ই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দুটো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দু'মাস পর মা। তখন বিলেত ফেরত ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কাণ্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝে মধ্যে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে ?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত—হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু' হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও ছোঁয়াল না গৌরকে। দূরদর্শী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কোনোদিনই। করলেই মল-পরা দুটি পা মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ মুখ ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগীর নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝম্-ঝম্ মাথা থেকে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড় মজ্জা সব সেই ঝম্ঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে

বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনীর বাড়িতে উঠে গিয়ে বালীগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুঁল না কমদামের ল্যাণ্ডমাস্টারটা। তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে, গৌরহরির আয় থেকে সে নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এই সব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল, এই সব গৌরহরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশী বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ঐ নাচুনে মাগীর বেহদ্দ নাচ। তাই চিন্তা-ভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে—আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল—এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম! এই যে রুখো-শুখো দুটো হাত-পা, মগজে এই যে এত ঝমঝম্ এই সব নিয়ে আমি কতদূর কী করছি দুনিয়ায়? কী করার ছিল আমার? আর কী-ই বা করেছি? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরোনো ল্যাণ্ডমাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া! এই করতে করতেই কি শালা কোনো মানুষ পারফেক্‌শানে পৌঁছাতে পারে! অ্যাঁ? বগলার পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেক্‌শান লেখা ছিল? বিলেত না, বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বৌ না, না ছেলে-পুলে—কেবল একটা ভুতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার ক্বাথ—আর শালা পুলিশবাবা, লাল নীল আলো—ঝুটঝামেলা—গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি—টেরিটিবাজার থেকে সাউথ সিঁথি—আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার?

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গীর। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়ে-মানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারী আছে। সোয়ারী জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি

দাঁড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূর থেকে—তার গাড়ির পিছনের কাচে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘণ্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় হয় তার। আর সেই সঙ্গে কখনো সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু আধটুকু ছোঁয়া যায়। সেটুকু ভাল লাগে না গৌরের। কেবল বদরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিম্ঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটকু পাচ্ছে, এইটুকু পারফেক্শান। তার বাপের কিনে দেওয়া ল্যাণ্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে গৌরহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালই রাখোহরির। একের পর এক কেস জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন গলিঘুঁজির পথে—কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালীগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাব্ড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যবসা। রিফিউজি কলোনীর বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই এখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই। কোনো সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয় সম্পত্তি ঝেঁকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ্। বাপের দেওয়া ল্যাণ্ডমাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনীর দুখানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলায় খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়—শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস্! আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াবো।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সীটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাচে তাদের ছায়াতুটোকে দেখা যায়, লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী! গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপ্টা মারে। নিওনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ঐ দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে—এই তো বিদেশ! এই তো শালার লণ্ডন, যেখানে একদা ল্যাণ্ড করেছিল তার তুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হয় তো মেম বৌ। বেগড়বাঁই বাঁধালো মগজের ঐ ঝম্ঝম্ শব্দ, আর তুটো রুখো-শুখো হাত-পা।

ভাবতে ভাবতে শ্বাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুস্ফুস্ পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লণ্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

—ও মা! এসে গেছি! মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়াতুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখ্খা পার্টি! ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যাণ্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিছানা, ন্যা হানিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না, জিজ্ঞেস করল—কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল—চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রূক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে ডাঁটিয়াল ছেলেরা মিটার-ফিটার দেখার ঝামেলা করে না। গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে। সেও আন্দাজী মারে। বগলুর পোলা গৌরা—প্রেস্টিজে সে কম যায় কিসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যাণ্ডমাস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে। মিটারটা আবার লাল শালুতে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাপ করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রীটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলুদ একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধ্-ধ্ করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর সুনসান ডেক। কোনোখানে কোনো মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনো দেখে নি গৌর। সে হাঁ করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন্ কোন্ মুলুকে চলে যাও হে জাহাজবাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন্ গাড্ডায়! ফিফ্‌টি পারসেন্ট্ বলে গৌরার সব ফুর্তিই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার ঐ ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার লাইফ্‌টায় কী আছে বলো তো! ঐ ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টার, দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর ঝমাঝম্। কলকাতার সওয়ারী এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে

জীবন! বাবা জাহাজ সাত ঘাটের জল খাও তুমি। সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা!

মার শালা ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতার সওয়ারীদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফ্‌টি পারসেণ্ট, হাফ-ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যাণ্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেকে বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশী বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না, জাহাজখানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস্ শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই। জাহাজখানা হাফ-ফিনিশ গৌরাকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে—বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলুম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরবো লণ্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দুরকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থেকো হে বগলাপতির ব্যাটা। বগলুর ছাওয়াল, সংসারে চালু থাকাটাই সাকসেস্।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশের বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরেই সংসারে চালু থাকবে। বগলুর ফোরসাইট ছিল বটে। আজো যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ঐ ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরেই। ঐ যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ঐ ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টার—মগন সিংএর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন' হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোঁয় নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরে, তবু কখনো-সখনো গঙ্গার ঘাটে এলে

নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সওয়ারীদের আর তিন লাথি নিজের কপালটায় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলুও বলত এরকম কথা তোমার মতো। সংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দূরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বঁড়শি বিঁধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায় জাহাজবাবা। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকার টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা—হাফ-ফিনিশ ফিফ্‌টি পারসেণ্ট গৌরা—খুব বেশীদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট্। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ, আমি যখন মুরগীহাটার সওয়ারী বাগবাজারে খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছো টোকিও, কিংবা ফিরতি পথে লণ্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখ তুমি, দেখ সমুদ্রের ঝড়। ইটালীর জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মাস্তুলে। বাবা জাহাজ, বুকের বঁড়শিটা মাঝে মাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যাণ্ডমাস্টার। হাফ-ফিনিশ বলে গৌরা যে কোনো কিছুই পায় নি জাহাজবাবা!

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আহ্। বগলুর তুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল, দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশ, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভূতুড়ে ল্যাণ্ড-মাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যাণ্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর, বনেট বন্ধ করে। ড্রাইভিং সীটে বসে চাবিটা বের করে, তারপর হঠাৎ আগা-পাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনের সীটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা!

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যাণ্ডমাস্টারটা কোনোদিনই সেন্ট পারসেন্ট গৌরহরির না। ওর ফিফ্‌টি পারসেন্ট ঐ শালা ডেডবডিটার—এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে গৌরহরি বুঝতে পারে—শালা ভূতেরাও দাবি-দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে-হেজে গেছিস—তবু একটা পুরোনো ল্যাণ্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগলু সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা—দ্যাখ—এই হাফ-ফিনিশ আমার জীবনটা—টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছাওয়াল আমি—তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ঐ ল্যাণ্ডমাস্টারটা—যার ফিফ্‌টি পারসেন্ট ভূতের কব্জায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনো ইন্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার ল্যাণ্ডমাস্টারে? ল্যাণ্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দূরে দাঁড়িয়ে তার ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে—হেই। কাম হিয়া—

অমনি গৌরের মাথার ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক্ করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে সেন্ট অ্যান্টনিজের পাক্কা ইংরিজিতে বলে—এখানে কি হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও—

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলানো। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে নেড়ে গৌরের ধমক-ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে—টেক মি টু স্যু।

—স্যু ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো—

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি? চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে—মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি। তুমি কেটে পড়ো—

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ্য করে, লোকটা বেঁটে-খাটো, বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপীতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রঙ রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন দিশি। তবে জাহাজী বলেই মনে হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনো কোনো স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের ক্বাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। ধোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

—নামবে কি না বাপু, না কি পুলিস ডাকবো? গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেন্ট অ্যান্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি

ভড়কে যায়। নামবে কিনা ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাব ভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজীর পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে। বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত, তিন নম্বর যদিও হাফ-ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজী।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে—আমাকে স্যার কাছে যেতেই হবে। আমাকে পৌঁছে দাও—দয়া করো—বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে—আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই। একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি, আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখ কত টাকা—

টাকা দেখাচ্ছে! টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি—যে কিনা ডজ্ গাড়িটার আয়না দিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে—তাকে কিনা টাকা দেখাচ্ছে ফুটো পকেটের জাহাজী! ভারী রেগে যায় সে। ভাল হাতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজীটার হাত ধরে টান মারে, চেঁচিয়ে বলে—নামো, নামো—টাকা আমি বিস্তর দেখেছি—

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভিতরে সেঁধোতে থাকে। পা দুখানা সীটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে, বলে—দয়া করো—

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরী। আর লোকটা সেন্ট পারসেন্ট হাত-পাওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সীট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে—ফোট্ শালা বেজন্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই—

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজীটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে—আরে বাঃ, তুমি বাঙালী দেখছি।

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল—তুমি সাহেব নও?

লোকটা সীট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে—আরে দূর! আমি তোমাকেই সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি, শিখলে কোত্থেকে অমন ইংরিজি?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোত্থেকে শিখেছো?

লোকটা—যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমনভাবে—সহজ ভঙ্গীতে উঠে বসে, হাত-টাত ঝেড়ে বলে—আমি শিখেছি জাহাজে, সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালীর মুখে ভাল ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে—আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না—

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিট্‌মিট্ করে তাকায়, বলে—আমি শুধু একটু বীয়ার খেয়েছি। মুখ শুঁকে দেখ। হাই—

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলে—তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালী দাঁত চিকমিক করে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে—আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাপ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না। গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে—

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড় একটা দেখে নি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলিশ-বাবা ধরে, কোন সওয়ারী কোন গাড্ডায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যাণ্ড-মাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়েই কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে—তোমার মতলবখানা কী ?

লোকটা মিনতি করে—আমাকে নামিয়ে দিও না। স্যার কাছে পৌঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে—সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয় নি—

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়—এই নাও সিগারেট—

গৌর মাথা নাড়ে—না।

লোকটা মিনতি করে—নাও মেট। খুব ভাল সিগারেট। পুরো প্যাকেটটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌর মাথা নাড়ে—না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে—আমার জাহাজের জাহাজীরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজীটা সারা সন্ধেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি—

জাহাজীটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। টপ্‌টপ্ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড়্ বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুবলা বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজী হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে

না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন কেব্‌লে যায়। মায়েদের মতো 'ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে—হু্য কে ?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁত দেখায়। সোনালী দাঁতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামী গ্যাস লাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে—বোসো—

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যাণ্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সীটে বসে দরজাটা খোলা রেখে, গঙ্গার হুড়্‌ বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে—দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজীরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয়-স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, কত হাগিং কিসিং, কত আদর ভালবাসার কথা হয়—না ? বুঝলে, আমারও ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চা বেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত, বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না। কলকাতা-মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রঙ পাল্টে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদর হত আমার, কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুঁয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল, মা মরল। দুবার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল ছোটো ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম। কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখি নি-

জাহাজের খালাসী। আমাকে ব্যাটা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি-বাড়ি সে ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তার বৌ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল—জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিঁড়ে যায়। তখন কলকাতা-মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লণ্ডন বা টোকিওয় যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—আরে, আমার যে কোনো পিছুটান নেই! আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না! অন্য জাহাজীরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল—বুঝলে! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশী চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হত, ঐ শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয় নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে—কেমন শব্দ বললে?

—ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মতো।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে—আমার হত ঝম্‌ঝম্‌। অনেকটা নূপুরের মতো।

—আই। লোকটা বলে—তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাঁইঝাঁই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজী পরামর্শ দিল—বিয়ে কর। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম—সান ফ্রান্সিসকোতে। আমার বৌ বেশ সুন্দরীই ছিল—খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা পয়সা যোগ করে আমরা তিন-চার মাসের লম্বা হানিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা জায়গায়। সে কী ফূর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হানি-মুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল—লম্বা ট্রিপ। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক মাস বৌয়ের চিঠি পাই নি। জাহাজ

আমেরিকা-মুখো হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল—এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম, বৌ জাহাজঘাটায় আসে নি। খানিক দূরে এক ছোট্ট টিলার নিচে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল—খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউ ইয়র্কে চলে গেছে। বুঝলাম, বৌ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায় না। মেমসাহেবরা বেশীদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি, বীয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড্ডায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালবেসে ফেলল। বুঝলে, মেমসাহেবরা চট্ করে ভালবেসে ফেলে। আমারও বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তাই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বৌ গরীব, অরফ্যান। ভাবলাম, গরীবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছাকাছি। মাস দুই হানিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বৌ টিকল। কয়েকবার ট্যুর সেরে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি, দেশে ফেরার আনন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়, ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমি জিরেত কিনে বসবাস করব। পোলট্রি, ফার্মিং করব। তা সেবার লম্বা ট্যুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ ট্যুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে হ্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার ট্যুর-এ বছর দেড়েক লেগে গেল।

বৌ মাঝে-মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জানিয়ে টাকা-পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেড় দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন! ঠিক আগেকার মতো ঘর-গেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না! বৌ কেমন চোর-চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঁঝ দিচ্ছে! বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ-মুখ সে-মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বৌটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজীদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বৌয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়ত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে—তা কত টাকা-পয়সা আর সোনাদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দুজনে—এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই। মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনো কোনো মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামীর বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে তিন-চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ-টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনো পুরুষ সে কদিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে লোকে, সে রকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল, দুই বৌয়ের জন্য দুরকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দুধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই একমাত্র জাহাজী—যার ফেরা নেই, কেবলমাত্র যাওয়া আছে। জাহাজ ভোঁ দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে ঝুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে-কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন

কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো 'মা' বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল, মা তো নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাবো? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শূন্য জাহাজ, সব জাহাজী গেছে ফূর্তি লুটতে। আমি একা একা ভূতুড়ে জাহাজটার আনাচে-কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাঁদি। কাঁদি মরা মা-বাপের জন্য, দুই বৌ আর না-হওয়া বাচ্চা-কাচ্চার জন্য, কাঁদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজী আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস্ বার-এ। স্যু-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাঙলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালী মেয়ের মতো। ভারী ভাল লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারী আমুদে মেয়ে, বলল—তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। রাত তখন অনেক। ফট্‌ফটে জ্যোৎস্নায় আমাকে স্যু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে এসে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারিদিক সুনসান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দুজনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধ —ও রকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখি নি। সামান্য মদ ছিল দুজনেরই পেটে, ঝুমঝুমে মাতাল ছিলাম দুজনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ স্যু লাফিয়ে উঠে বলল—দেখ দেখ, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে! আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে

মুখ তুলে বলে—ইস্ দেখ, কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে—আঠার মতো ঘন···কী মিষ্টি···কী স্বাদ···! দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা পেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি—কী স্বাদ—কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজী ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দুজনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়ি নি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন-চারদিন ছিলাম স্যুর কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধেবেলা দুজনে হাল্কা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া—আহা—

জাহাজীটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গৌরের আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে ছোটো হয়ে। জাহাজীটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গৌরের দিকে চায়, বলে—এসব আড়াই তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই! ফাঁকা। বুঝেছি, স্যু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র স্যু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ স্যুর দেখা পায়। তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজীটা রথম্যানের প্যাকেটটা গৌরের ডান হাতে গুঁজে

দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে—বার ওয়েসিস্—স্যু—তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও—

গৌর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনো হজম হয় নি।

জাহাজীটা মিনতি করে—দশটার পর স্যু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার স্যুর সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর একবার সেই জ্যোৎস্না খাবো। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিনবছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুর গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজীরা পাছে স্যুর কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে—এমনই কপাল—সব জাহাজী গাড়ি পেল—বাদে আমি। দু'ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছি, একটাও থামে নি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি—আমাকে ফেলে যেও না—সেই জ্যোৎস্না স্যু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান—জ্যোৎস্না—সেইসব ফল—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—কী নেশা তার—বয়স কমে যায়—চোখের জ্যোতি বাড়ে—শরীর ফুঁসে ওঠে—আর একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাবো না—মেট, তাড়াতাড়ি করো, স্যুকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়—

—ঠিক হয় তবে। গৌর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে পেট। বিড়বিড় করে বলে—দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গৌরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চল্ বাবা ল্যাণ্ডু, জাহাজীটাকে খালাস দিই—

গৌর গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সীটে ঝিম্ মেরে থাকে জাহাজীটা। আয় বাবা ধরমতলা—বার ওয়েসিস্—জাহাজীটাকে ডেলিভারী দিই। গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে—মাইরি—জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে,

জাহাজীটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝিম্ মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনো। জাহাজীটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে, পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজীটা নামে, একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে—কীপ্ ইট মেট্। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে—এই, চেঞ্জ্‌টা নিয়ে যাও—

জাহাজীটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের। বখশিশ্-টখশিশ্ সে কখনো নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশী পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার? বাপ বগল্ তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে!

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত পয়সা গুণেগেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজীটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক্ করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ধীরে সুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে—শুঁড়িখানায় যেমন হয়—তেমনি নরম আলো-টালো, চেয়ার-টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর মাতাল। লম্বা কাউন্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক্, নানা রঙের বোতল চিক্‌মিক্ করে। সেই কাউন্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন-চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজীটাকে নিম্-আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরো দু-এক পা এগোয় গৌর। দু-একজন মুখ তুলে তার

নেংচে-হাঁটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝ-পথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজীটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে—এই—

জাহাজীটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দু' কাঁধ দু' হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও—বলে গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউণ্টারের দিকে এগোতে থাকে।

—কী হচ্ছে। ছেড়ে দাও—

জাহাজীটা কেবল চাপা গলায় বলে—কম্ অন্। স্যুকে এইখানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কম্ অন্।

কাউণ্টারের স্যুট-পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজীটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজী ইংরিজিতে বলে—স্যু—শ্যামলা পাতলা চেহারা—মিষ্টি মুখ—চোখের পাতা ভারী ভারী—খুব ফুর্তিবাজ—তিনবছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম—খোঁজ দিতে পারো ?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে—না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিনবছর লম্বা সময়—কত কী হয়ে যায় !

বলে লোকটা হাসে।

কাউণ্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজীটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল —আমরা সবাই স্যু, কেউ কু নই গো !

বলে হেসে অন্য একটি মেয়ের কাঁধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজীটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে, তারপর হতাশ গলায় বলে—না, তোমরা নও। স্যু অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

—শোন লতিকা—বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাঁধে হেসে গড়াল। দুজনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বগপুর পোলা গৌরা—এ কোন্ গাড্ডায় এসে পড়েছে! জাহাজীটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ-হাতখানা। কমজোরী হাতটা তার—ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই, চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজীটা ঠোঁট চেটে বলে—বড় তেষ্টা। চলো একটু বীয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে—আমি না। চেঞ্জ্‌টা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও—

সে সব কথায় কানই দেয় না জাহাজী। বলে—তেমন কিছু না। একটু বীয়ার— এসো—

তার শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজী, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে—তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না মেট্। কলকাতায় এক স্মু ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভাল লোক—

দুটো বাহারী কাচের জগ্-এ বীয়ার আসে। আসে সেঁকা পাঁপর, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনো তার ডানহাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা, বাঁ হাতখানা জাহাজীর কব্জায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনো কাটে নি। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে। সে একটু ভাববার চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে! চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর, অমনি তার মাথার মধ্যে একখানা মল-পরা পা ঝম্ করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা-চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনো খায় নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করে নি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর

ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিঁকে থাকে, আর থাকে তার ল্যাণ্ড-মাস্টারখানা—তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মল-পরা পা আর একবার ঝম্ করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, টের পেল গৌর। এখনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠাণ্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজীটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে—বড্ড তেষ্টা। বেয়ারা—

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

—আরো।

বেয়ারা জগ্ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটক্ষণ। তারপরই ঝুপ্ করে মুখোমুখী চেয়ারে বসে পড়ে দুজন। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই দুজনই।

—একটু খাওয়াও না গো! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! যে মেয়েটা হেসেছিল সে বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে-ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, বেশী বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুল বারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ঐভাবেই ফেলে রেখে বলে—নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উল্টে বাড়িয়ে ধরে—দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা—কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যাণ্ড-মাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফুর্তি লোটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বীয়ারের ঝাজটা তার পেট থেকে মগজে রিন্‌রিন্ করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিন্‌রিন্ শব্দটা বহুদূর গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে—এঁটো খাবে ?

—এঁটো আবার কী গো ! প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—মুখের এঁটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

—আমাদের সবকিছু এঁটো—

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গীও ভাল না। গৌরের বড় ঘেন্না করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকী অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে—এবার ফোটো। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজীটা জগ-এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে—আরো খাবে ? খাও। বেয়ারা—

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

—এবার বলো। জাহাজীটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

—কী ? মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

—স্যার কথা।

মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।

—কেমন ছিল তোমার স্ত্রী? রোগাজন জিজ্ঞেস করে।

—লম্বা। সোনালী চুল। নীল চোখ। খুব ফর্সা।

যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজীটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—এই, তুমি যে একটু আগে বললে শ্যামলা রঙ, চোখের পাতা ভারী ভারী—

লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজীটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে বলে—বলেছি?

—নিশ্চয়ই। গৌর ডান হাতে টেবিলে চাপড় মারে।

জাহাজীটা শ্বাস ছেড়ে বলে—তবে তাই।

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজীটা প্রশ্ন করে—চেনো?

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে—না।

—সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাঁতগুলো বের করে গরগরে হাসি হাসে—জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ—কত কী খাওয়াই আমরা—

জাহাজীটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে—পৃথিবীর সাতঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ঐ কথা বলেছে। কেউ পারে নি। তিনবছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজী।

—চলো মেট—সময় নেই—

তারপর মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে বলল—তোমরা খাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না—তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।

জাহাজীটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

গৌর চারদিকে একটা রিমঝিম আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক

নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমা হল্-এর আলোগুলো আরো রঙীন, মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজীটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরোনো বন্ধু—মাঝখানে কেবল একশ বছর দেখা হয় নি।

দুজন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি [illegible] ল্যাণ্ডমাস্টারের কাছে আসে।

—এবার কোথায়?

জাহাজীটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে—স্ত্যি যেখা[illegible]বের করতে হবে—কাছাকাছি কোনো বার-এ সে আ[illegible]

গৌরের এখনো যাকে নেশা বলে তা[illegible] গাড়টা সে দিব্যি চালায়। জাহাজী তার বাঁ পা[illegible] সীটের ওপর রথ্-ম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আ[illegible]তে পারছে গৌর। না, নশা হয় নি। গাড়িটা [illegible] যাচ্ছে।

—বাস্ মেট্—এ[illegible]গাটা—

জাহাজী হা[illegible]রের হাত চেপে ধরে

গৌর গা[illegible] বাঁ পাশে আর একটা বার। খুব বড় নয়, [illegible] ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ [illegible] পড়ে যায় মানুষের।

[illegible]জী হাত ছাড়ে না।

—নামো

গৌর হাই তুলে বলে—আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো—

—না—আমি একা খুঁজে পাবো না—শহরটা বড় অচেনা লাগছে নামো মেট—

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তিবাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম াতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোকজন, কাউণ্টারে ওয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের

মাউথপীস্ মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম্। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদ সংগীত। তবু ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগ্স্। আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মনের উল্লাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউন্টারের ওপাশে সাহেবী চেহারার দুজন লোক ভারী ব্যস্ত। টাকা-পয়সা গুণে নিচ্ছে। জাহাজীটা কাচের ওপর টোকা দিতে দুজন মুখ তোলে।

—স্যু নামে একটি মেয়ে—গায়ের রঙ শ্যামলা—বাদামী চুল—নীল চোখ—

মাতাল। গৌর হাসে। বলে—অ্যাহ—গায়ের রঙ শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যা!

—হয় না? ভারী অবাক হয় জাহাজী। বলে—তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গৌর একটু ভাববার চেষ্টা করে। মাথা রিমঝিম করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে—কালো।

—তো তাই।

জাহাজীটা আবার লোক দুটোর দিকে ঝুঁকে বলে—তার চোখ আর চুল কালো—খবর দিতে পারো?

লোক দুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে। একজন নরম গলায় বলে —দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

—আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

—অফ্ কোর্স। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে—ড্রিংক্স্?

—হুইস্কি। বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজী।

—এই—ডাক দেয় গৌর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজী। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদ সংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে—এখানে স্যু নেই। এসব তার জায়গা নয়। আরো নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। টাবুর বিষাদ-সংগীতের করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানীর মতো মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজীও।

—আমি জানি স্যু এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম। জাহাজীটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনো মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে। না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

—চলো মেট্—

গেলাস শেষ করে গৌর ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাঁকা লাগে। তবু বলে—চলো—

—কোথাও না কোথাও আছেই। জাহাজী আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজীর মেয়েছেলে স্যু? গৌর ঠিক বের করবে।

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর—বগলুর ছাওয়াল—যার হাতে গাড়ি কোনোদিন ঘষাটাও খায় নি—ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গীর বড় রাস্তায়।

—ঐ যে দেখছ উঁচু মিনার—ঐ যে—

এই বলে জাহাজী গৌরকে কনুয়ে ঠেলা দিয়ে অদূরের মনুমেণ্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে—ঐ মিনারটা আমি আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভাল হয় নি ?

মনুমেণ্টটাকে আবার ভাল করে দেখে গৌর। দেখে-টেখে মাথা নেড়ে বলে—ভাল। দিব্যি উঁচু।

—আই। জাহাজী শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পার্ক্ স্ট্রীটকে কখনো কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বীয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরো মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লণ্ডনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজী বলে—লণ্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি।

গেট-এর কাছে দু'জন সাহেবী পোশাক পরে দাড়ানো। তারা সিঁড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুই দরজা সে আর দেখে নি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে, জাহাজীটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

—কম অন—সময় নেই—এখনো আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না—

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল—সুন্দর সিলিং—তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ—কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মতো নয়! কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম! এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনো ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজী তাকে টেনে তুলল।

—সময় নেই মেট—

—ওঃ হ্যাঁ। ঠিক। গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা, তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। তার দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত—গৌরই পুরোনো ডজ্ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যুট আর বো পরা বিলেত ফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনায়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ্ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ-ফিনিশ গৌরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে—একটু নেংচে হাফ-ফিনিশ গৌরা—বগলুর ছাওয়াল—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর—আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে! কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ! এরকম আর দেখে নি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা জানালা নেই—কেবল আলো আর রং, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ—একটু স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে—যেন বা বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা! বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কিনা! হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজী তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে

থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে—উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়—আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো ঢিপ্‌ঢিপ করে বাজে।

জাহাজীটা হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়।

—চলো মেট—শীগগীর --

—কোথায়?

—ঐখানে—ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে—একটা মেয়ে—স্ন্যাহতে পারে—

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙীন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা। তরা দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

—টিকিট?

জাহাজী হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামী শরীরের চামড়া যেন তেল মাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়ালী নরম মাংসের ঢেউ। কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানী পুঁতির কাঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে—আবার আলোয়—মায়াবী যাতায়াত করে লোলা। পৃথিবীর পুরুষকে ডাক দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ড লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে—আবার আলোয়—আবার অন্ধকারে

—তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। শ্বাস পড়ে, শ্বাস ওঠে—কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ—লোলা-লোলা-লোলা—

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ্ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখে নি।

অন্ধকারেই জাহাজী তার হাত চেপে ধরে—মেট, এ নয়—

—নয়?

—নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলা তার ঘাগরা ছেড়েছে, কাঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো—এসো—এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা—

তবু সে স্যু নয়। হতাশ জাহাজীকে সে খাওয়ায় নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে—আর তখন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে স্যু-র খোঁজে।

আই। গৌর টের পায়, গাড়িটা চড়ছে। উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে পাক স্ট্রীটের আলোর ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্র্যাফিক-বাতি দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখবার দরকারই বা কী? গাড়িটা উড়ছে যখন!

—মেট। জাহাজী মৃদুস্বরে বলে।

—উম্।

—নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল। ভিখিরি। মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ঐ আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ঐ আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস্। তাঁকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনমান শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশী হয়। গাড়িটা আর একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভাল লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—দেখ, কত উঁচুতে উঠেছি।

জাহাজীটা গলা বাড়িয়ে নিচের দিকে চায়, তারপর বলে—আর একটু ওপরে ওঠো মেট। স্যু বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় বেলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিস নেই, কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজীটা এলিয়ে পড়েছে সীটে। বিড়বিড় করে বকছে—বাড়ি বাড়ি খুঁজবো। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরবো। প্রতিটি শুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় যাবে স্যু?

গৌর রাস্তাটা ভাল দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে? সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরী নামছে। শিশু-পরী সব। ন্যাংটো, ফর্সা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো ঝুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে

চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনিই সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

—কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়।

বলে হেঁচকি তোলে জাহাজী।

—গাড়িটা জোরে চালাও মেট। নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

—পাগল! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

—কাদের? জাহাজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—ঐ যে, পরীরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরী, ভাল উড়তে শেখে নি এখনো। জাহাজী ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরী দেখার চেষ্টা করে।

—কোথায় পরী?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

—ঐ তো। সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ঐ দেখ একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল—ঐ আবার উড়ে গেল! নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুঁড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

—কিন্তু পরীরা আছে ঠিক। সেন্ট অ্যান্টনিজে এরকম পরীদের ছবি ঘরে ঘরে ঝোলানো থাকত। সোনালী ডানা লাল ঠোঁট, নীল চোখ……

জাহাজী বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে—নীল চোখ! নীল চোখ! স্যুরও ছিল ঐ নীল চোখ। ঠিক নীল নয়, একটু বাদামী। কিন্তু ওর গায়ের রঙ ছিল বড্ড কালো। যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত—বুঝলে—যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন ওকে কিছুতেই খুঁজে পেতাম না। ওর ঐ কালো রঙের জন্যই। স্যুর বুক ভরা দিল এক শ

মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোতো, আর আমি দু'হাত বাজিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে কখনো দেয়ালে, কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোতো খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোষাকের নিচে। একশ মজা ছিল ওর। বড্ড কালো ছিল বলে—

—কালো! গৌর ভারী অবাক হয়—কালো কোথায়! তুমি যে বললে, ফর্সা আর নীল চোখ।

—বলেছি?

—আলবাৎ!

—তবে তাই। জাহাজীটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—তবে তাই। কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে—দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফর্সাই কী? সব সমান।

—না না। ঘরটা একদম অন্ধকার হত না কখনো। বাইরে জানালার সোজাসুজি একটা নিওন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা! আঃ হাঃ কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—কী যেন—

লিপ্‌টন? লুফ্‌টাহান্‌সা? গুডইয়ার? ক্যাপস্টান?

নাঃ। ওসব নয়। কলকাতার শুঁড়িরা—জাহাজী হেঁচকি গেলে।

—যেতে দাও। গৌর বলে।

জাহাজীটা মাথা নাড়ে—না না। যেতে দেবো কেন? সেই নিওন সাইনটা ছিল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজী মুখে আঙুল পুরে ভাবে। শিস্ দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরীরা আরো নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরী নেমে আসছে৭ দু-তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাচ তোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানালার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো। আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেবো।

—ইয়াঃ। সেই নিওন সাইনে লেখা ছিল—ইউ ওয়াণ্ট্ লায়লাজ্ ব্রেড। তুমি চাও লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বল্‌ত 'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর 'লায়লার', সবশেষে 'রুটি', চারটে শব্দ। 'তুমি' জ্বললে ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত—সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও', সেটা জ্বললে আরো একটু সবুজ আলো আসত। তারপর 'লায়লার' থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত, মাঠঘাট, সবুজ ঘাস—এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ্ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত—'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর—জাহাজীটা হেঁচকি তোলে।

পিছনের জানালা গলে তিনটে পরী ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুঁটো, সাদা। মোটা মোটা থোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালী ডানাগুলো পাতলা ফিন্‌ফিনে—যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

—ই-ফ্! জাহাজী আবার হেঁচকি গেলে।

—চোপ্! ধমক মারে গৌর—হেঁচকি তুলো না। পরীরা ভয় পাবে।

জাহাজী অবাক হয়ে বলে—কারা বললে ?

—পরীরা।

—কোথায় ?

—পিছনের সীটে বসে আছে। তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে—কোথায় কী ?

—আছে। তাকিও না।

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—আসলে কলকাতার শুঁড়িরা—

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজী। গৌর গাড়িখানা ফাঁকা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডে তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে।

গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরীদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজীটা বলে—আমরা জানালায় বসে সেই নিওন সাইনটা দেখতাম।

—কোন নিওন সাইন ?

—সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিওন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাতো। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম—স্যু, লায়লা কে ? স্যুও আমাকে জিজ্ঞেস করত—লায়লা কে ? আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিওন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত —তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লার রুটি। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম—স্যু, তুমি লায়লার রুটি চাও ? সে বলত চাই। ফের সে আমাকেও ঐ কথা জিজ্ঞেস করত, আমিও চাই কিনা, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখেছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না।

—পাওয়া যায় না ?

—না।

—সে কী ? তাহলে নিওন সাইনটা ছিল কী করতে ?

জাহাজীটা একটু ভেবে বলে—অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনো লায়লার রুটির খোঁজ করি নি! দিনের বেলা মনেই থাকত না। রাত্রি বেশী হলে যখন নিওন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজতে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনো মাঝে মাঝে মাঝ-রাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিওন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে তুমি চাও ···তুমি চাও···তুমি চাও···ভয় পেয়ে উঠে বসি, আর তখন বাদবাকীটা মনে পড়ে—লায়লার রুটি···লায়লার রুটি···লায়লার রুটি······

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজীটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বাল্‌তেই গৌর ধমকায়—আলো জ্বেলো না।

—কেন ?

—পরীরা পালাবে।

—আঃ। জাহাজী হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে—লায়লার রুটি। সবুজ আলো, স্থ্য, জ্যোৎস্না—মেট, এসব কোথায় গেল ? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে ! কিছু নেই !

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গৌর দিক ঠিক করতে পারে না। আসলে গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গৌর—গৌরা—বগলাপতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। কিন্তু এখন—এই পরীদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গৌর কেবল নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ—বেশ্যার চোখের কাজলের মতো—সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাসে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজী হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে—এটা কোন্ জায়গা ! অ্যাঁ ! কোন্ জায়গা ? থামো মেট।

গৌর থামে।

একটা পুরোনো প্রকাণ্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝ্‌ঝুম। চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তার টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গম্ভীর গলায় বলে—কী জানি !

জাহাজীটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটা আমার চেনা।

গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তারা খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিস পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষে কটা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

গৌর হাই তোলে।

জাহাজী হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে—বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।

—কার কাছে?

জাহাজী ফিস্‌ফিস্ করে বলে—স্যুর কাছে।

গৌর চমকে বলে—এই বাড়িটাই?

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—এই বাড়িটাই!

তারা নামে। আগে জাহাজী, পিছনে গৌর।

বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ পাওয়া যায়। আর বহু পুরোনো এক বদ্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।

জাহাজী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত। জাহাজী শ্বাস ছাড়ে।

বলে—মেট, চলো। দেখা যাক।

দুজনে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়ি যতই ওপরে উঠেছে ততই আরো অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুনবালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে থাকে। মুখে গায়ে ঝাপ্‌টা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।

—ক তলায় ? গৌর জিজ্ঞেস করে।

—দশ তলায়। আমার মনে আছে।

গৌর অবাক হয়ে বলে—কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার পাঁচ তলা !

—ঠিক বলছো ?

—ঠিক। এ কলকাতার পুরোনো বাড়ি, চুন সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশতলা হয় না।

—তাহলে ! বলে জাহাজীটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে—তাহলে ক তলায় ! ঠিক মনে পড়ছে না তো !

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝি হঠাৎ ডেকে উঠে আরো নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে তো খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরীরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোর গন্ধ।

দুজনে আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তারা খসে, চুনবালি পড়ে সিঁড়িতে পুরু আস্তরণ। পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইঁদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানালা হাঁ-হাঁ করছে খোলা। বেশীর ভাগেরই পাল্লা নেই। দু-এক জায়গায় বাঁশের ঠেক্‌না দাঁড় করানো আছে। জাহাজীটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে। চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোঁকে।

কোনো ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু-একটা কৌটো-বাউটো পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটাই। এইখানে স্যু থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশী। ইটের স্তূপ পড়ে আছে। ইঁদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঁঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এঘর থেকে ওঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক একবার এক একটা জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখে জাহাজী। মাথা নেড়ে বলে—এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো! অন্য ঘরে চলো মেট। যে-ঘর থেকে সবুজ নিওন সাইনে দেখা যাবে—তুমি চাও লায়লার রুটি—সেইটাই স্যুর ঘর। প্রথমে জ্বলবে 'তুমি' তারপর 'চাও', তারপর 'লায়লার সবশেষে 'রুটি'।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যানট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরো বাঁশের ঠেক্‌না, ডেব্রিস, ইঁটের স্তূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজী। চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা ম্লান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজী মাথা নাড়ে—না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। স্যু তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখন সে লুকোতো তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে জ্বলে উঠত—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লা···লায়লা··· রুটি। সবুজ আলোয় ঝল্‌সে ঝল্‌সে উঠত ঘর, কিন্তু সেই আলোতে ঠিক গায়ের রঙ মিলিয়ে লুকিয়ে থাকত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি

গিয়েও ছুঁতে ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত। তখন আবার পাগলের মতো খুঁজতাম। বাইরে তখন সবুজ আলো দপদপিয়ে উঠত—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···এইরকম—ঠিক এইরকম ঘরে সেইসব দারুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর-কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজী। বলে—বুঝলে মেট, বড্ড কালো ছিল স্যু, কিন্তু মধুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরী চোখ—

—খয়েরী? অবাক হয় গৌর।

—খয়েরী নয়?

—দূর! বাদামী তো।

—তবে তাই। জাহাজী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়।

—আর ফর্সা রঙ।

—ঠিক আছে।

—আর কালো চুল।

আই। জাহাজী বলে। বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার পুরোনো পিছল অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মানুষের নয়। চামচিকে, আরশোলা, ইঁদুর, ঝিঁঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে, ডাকে। একটা বহু পুরোনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে এখনো রয়ে গেছে। তাতে একশো তুশো বছর আগেকার মানুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দু বিন্দু গুঁড়ো গুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়। ঝির-ঝির ঝুরঝুর। ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজী হঠাৎ লাফ দিয়ে তুই ধাপ সিঁড়ি উঠে যায়। কর্কশ চাপা গলায় বলে—মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

—দরজা?

—দরজা। দুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজী দেশলাই জ্বালতেই দেখা যায়, দুই মানুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নীরেট, বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজী হাতড়ে দরজাটা দেখে বলে—মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

—এইটাই কি স্যুর ঘর?

—মনে হচ্ছে।

জাহাজী সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে—কে আছো?

সাড়া নেই।

—কে আছো?

সাড়া নেই।

জাহাজী ক্রমে ক্রমে জোরে, আরো জোরে কড়া নাড়তে থাকে।

—কে আছো? কে আছো? কে আছো?

প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষ্যে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজী দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। চোখের সামনে রঙীন ডানাওয়ালা পরীরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকে।

—মেট।

—উম্।

—ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

—অ্যাঁ!

—কেউ আছে। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরোনো কাঠের দরজার গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনো শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাস কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফরফর করে উড়ে যায়।

—কোথায় শব্দ ?

—মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড় কষ্টের শ্বাস। শুনতে পাচ্ছো না ?

—না।

জাহাজী আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ট মুখখানা গৌরের মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

—অ্যাঁ ?

—এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায়। টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—কী বলছো ?

—এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের শ্বাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম শ্বাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

—তাহলে ? গৌর তার রথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

চুপ। জাহাজী ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে—ডিসটার্ব কারো না।

—কাকে ?

—যে মরছে, তাকে। সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের, কত খোঁজা, কত না-পাওয়া! বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে! আহা! এতদিনে একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মরার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইরে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা-মাকড় পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজী দেশলাই জ্বালে। সেই ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজী ফিস্‌ফিস্ করে বলে—এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, 'তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই স্থ্য রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে—স্থ্য?

—স্থ্য।

জাহাজী আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজীর দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গৌর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজীর আঙুল ছোঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনোখানে আলো নেই। তবু গৌর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা—তুমি চাও···

প্রকাণ্ড, ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজী দাঁড়িয়ে। গৌর হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে।

—কিন্তু সেই নিওন সাইন্‌টা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

জাহাজী শ্বাস ছেড়ে বলে—কোথাও নেই। কেবল ঐ ঘর থেকে দেখা যায়।

মাতাল। গৌর হাসে। বলে—চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দুজন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাঁকা, চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেক্‌না রুজু রুজু দাঁড়িয়ে। তার ভিতর দিয়ে পথ করে করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্প পোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝ্‌ঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই 'তুমি চাও লায়লার রুটি'-র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গৌরের মনে হতে থাকে, আছে। কোথাও না কোথাও আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনো রুটি পাওয়া যায় কিনা সে জানে না। ওরকম নিওন সাইনও তার চোখে পড়ে নি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখেছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ঐ রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান—তুমি···চাও···লায়লার···রুটি। ঐ কথা কটি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের ভিতরে কানায় কানায় উথাল-পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিওন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরো এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিঙ ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে। নিওন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চার-দিকে। আলটপকা বেরিয়ে থাকা লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেক্‌নোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু

এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলদে আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তূপ পার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে তারা।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট্ করেছে দেয়ালে। বড় ভাল লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজীও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

—কী সুন্দর সিলিং! গৌর বলে।

—উম্।

—ডুম্ জ্বল্ছে!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—ওটা সিলিং নয়, মেট।

—তবে?

জাহাজী বিষণ্ণ গলায় বলে—ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনো তলা নেই।

গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক। মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ঐ চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে পরীদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখা

উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। 'ওড়ো বাবারা ওড়ো' সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজী তার হাত ধরে—মেট, একমাত্র স্যুর ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ঐ বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু স্যুর ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন, মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টু-নাইট শী উইল এণ্টারটেন্ ওন্‌লি ওয়ান গেস্ট্। ডেথ্।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাঁই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দম্‌কা ধুলোবালি উড়ে আসে। চোখ কিরকির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে। হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। 'ডেথ্' কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নিচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা বেভুল ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে"ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে তারা একটু দাঁড়ায়। স্বপ্নের ঘর। দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্যু—জাহাজীকে যে একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন—তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনো ঘরের জানালা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে স্যুর গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি শ্বাস শেষবারের মতো টানছে স্যু, অন্ধকারে একা।

জাহাজী দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে—বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঁঝি, ইঁদুর, আরশোলার শব্দ। আর সব শব্দের

আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে গৌর। ক্ষয়ের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড় দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে জলে মাটিতে প্রবল ভালবাসার শীৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়াচ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু-পরীরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরোনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর করে বাড়িটার বুক। অন্ধকারে তার অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারা-গুলো খসে পড়ে। মৃত্যু ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে সে।

তারা দুজন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজী হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে—চলো মেট।

গৌর ঘাড় নাড়ে।

ল্যাণ্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতের গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যাণ্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে—চল্ বাবা ল্যাণ্ডু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা কিছুই চেনা যায় না। পুরোনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝরাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইণ্ডস্ক্রীনে। চাঁদের হলুদ আলো, টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার, ওয়াইপারের কাঁটা দুটো

পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটা-গুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দুজনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বদ্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফাঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্টো ছোট্টো ফুটোর মতো কয়েকটা আলো। বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইণ্ডস্ক্রীন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভাল করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা। মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যাণ্ডমাস্টার ঘড়ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যাণ্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চার-দিকে ঘোর অন্ধকার। তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যাণ্ডমাস্টারটার সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

—শালা! গৌর বলে।

—কী? জাহাজী ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—শালার ল্যাণ্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজী উত্তর দেয় না। উইণ্ডস্ক্রীনের ঝাপ্‌সা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকাণ্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

—মেট, ঐ বাড়িটা আমার চেনা। আর ঐ বাগান।

—আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে বলে—ঐ তো সেই বাগান যেখানে স্যু আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

—অ্যাঁ!

জাহাজী মাথা নেড়ে বলে—ঐ সেই ভিক্টোরিয়ার বাগান। চার-দিকে অন্ধকার, তবু দেখ ঐ বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো পড়ে আছে।

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে—কোথায় জ্যোৎস্না?

জাহাজী গম্ভীর গলায় বলে—আছে মেট। আমার জন্য এখনো একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজী হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।

—কোথায় যাবে? গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—ঐ বাগানে আর একবার আমি যাবো।

—পাগল! যা বৃষ্টি!

জাহাজী মাথা ডুলিয়ে বলে—জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাবো। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।

গৌর হাত বাড়িয়ে লক্ খুলে দেয়। বড় মায়া হয় তার। আহা, দুঃখী জাহাজী যদি ঐ বৃষ্টির ফাঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক।

দরজা খুলতে খুলতে জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—স্যু···জ্যোৎস্না ···সবুজ আলো···লায়লার রুটি···

বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজী। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস, প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।

হুড়্ হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোঁটা। সব ওলট-

পাল্টে করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর, বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁশ-জড়ানো চোখে, জাহাজী বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।

চারটে দরজাই ভাল করে লক্ করে গৌর। হাই তোলে। পরীদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সীটে তার দুটো রুখো-শুখো হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর বগ্‌লুর তিন নম্বর, হাফ-ফিনিশ, ফিফ্‌টি পারসেন্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

দুই

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রঙচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের। যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা আঠা করে শরীরে, তখন কলকাতার এধারের সওয়ারী ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, সুধা, জ্যোৎস্না, সেই জাহাজী। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগ্‌লুর তিন নম্বরের ঐটাই মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিক্‌শ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় ঢুকলে পুলিসের বিশ পয়সা। পুলিস হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিসের বাবা। কাট্ মারার চেষ্টা করলে এক চোখ ছোটো করে, আঙুল তুলে নম্বর ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিসের, দশ ছোকরাদের। বে-লাইনে সওয়ারী নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় কখনো

আসতে চায় না গৌর, ব্রীজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সওয়ারীর লাইন, পুলিস ছোকরা তারপর সবার বাবা জ্যাম্। তবু আজ এসে যেতে হল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবী হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারীর গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যার-ঘ্যারে। ইউ-পি লটারীর শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেইসময়ে ভাতঘুমে একটা ভাল স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারীর গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর—অর্থাৎ কিনা—গৌরহরি—বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেণ্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ঐ পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবীয়ানা।

সেই লটারীর ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল—ও বাবা, কোনো গাড়িই যে ইষ্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারবো না।

—হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে—ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদের শহর। আমরা মফঃস্বলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি। দশ বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাঁটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, জাঁতা, নতুন বেডকভারের পুঁটলি থেকে উঁকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা

নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

—ও বাবা, আমরা পয়সা দেবো। ফাঁকি যাবে না।

—ট্যাক্সির কী দরকার! বাস্-এ চলে যান।

—উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়। বাবাগো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশী হয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শাল-পাতার ঠোঙায় সিঁদুর মাখা প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সে সব এখনো গৌরের সীটে পড়ে রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বে-লাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর। একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফর্সা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে একটা। বে-লাইনে আরো কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তারমধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সীটে দুই পা তোলা, ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই—মলিন বসে আছে। কোনোদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে মামু?

মলিন মুখ তুলে হাসে—কী রে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

—খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে—তোমার সাউথে গ্যারেজ, আরামে আছো।

—আরাম কিসের?

মলিন হাসে—বেশ্যা আর ব্যাপারীদের গা আর বগলের গন্ধ শুঁকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে—এখনো সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছো নাকি ?

মলিন উদাস গলায় বলে—দিই। গাড়ির যেমন সওয়ারী দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিঘুঁজিতে ঘুরলে না তো, তাই তোমার চুল পাকে নি। তা সাউথে বৃষ্টিবাদলা কেমন ? আর মেয়েমানুষ ?

গৌর বলে—কী যে বলো !

মলিনের মুখের আটক কোনোকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখৎ যেমন-তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিসকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে লোটে। বলতে গেলে সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে দাঁড়ায় বড় হোটেলের তলায়, মাতালদের পৌঁছে দেয়। শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পাণ্টদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিস তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়কাটার মতিয়া কখনো সখনো মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয় সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লাল্‌চে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ ! তাকে একবার পৌঁছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ। গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখে নি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখো-শুখো হাত-পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর—গৌরা—বগলুর ছাওয়াল—সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত—হয়তো বিয়ে করতো মেম। এতদিনে কত কী হয়ে যেত গৌর ! মতিয়া সেই

গৌরকে দেখেই নি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রূক্ষেপও না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে এক বাড়ির সামনে। চাকর এসে টাকা দিয়ে গেল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই—গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটারও। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনি বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুঁকলে বোধহয় মতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে—তোমার ফাৎনা নড়ছে গৌর, দেখ।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাতফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফর্সা বৌ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে। লক্ করা বলে দরজা খুলতে পারে নি, নইলে উঠে বসত। ভুখ্খা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালার আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক দুই দিন বৌ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে—গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা এক ভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—কেন ?

—গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাত দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলে। বৌটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে—বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পৌঁছোতেই হবে।

—লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকনো গলায় বলে—লাইনে দাঁড়ালে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাবো। অন্তত আধঘণ্টা—বড্ড বিপদ—

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা-সুদ্ধু মানুষ রাস্তায় দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ, বিপদ' বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স্? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে? যেদিকে, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সওয়ারী ছাড়া তুলবেই না। পুলিস ডাকো, তম্বী করো। মলিন উত্তর দেবে না। পুলিস লাইসেন্স্ কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে, লাইসেন্স্ তার পোষা পাখির মতো। লোক-দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখ্‌খা পার্টিদের পিঁজরাপোলে বৃথা টক্কর মেরে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূর থেকেই খেঁকিয়ে বলে—বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভীতু ধরনের, বৌটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে চারদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে—ঐ গাড়ি কি যাবে?

মলিন মাথা নাড়ে—না দাদা, আমার বিয়ের পার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাসে লোক লাদাই হয়ে আছে। চার-দিকে মেলার ভিড়। লোক যে কোথা থেকে আসে! কোথায় যায়!

কোনো দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

—পি. জি. হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাক্‌সিনের ডেট্ আজ। সেকেণ্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাক্‌সিনটা না পড়লে কী হয় না হয়—

মলিন মোলায়েম গলায় বলে—বাসে চলে যান না! এখনো পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পৌঁছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও! আই বাপ্! ঐ জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে উড়ে যেত গৌর! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত-পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত। হত মেম-বৌ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাক্‌সিন বের করে নি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরো পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রীজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম্ আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পৌঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়—উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে—উঠবো ?

—বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বৌটা ভারী খুশী গলায় বলে—কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাক্‌সিন বের করেছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরী কলা-বোঝাই লরীর পেছনে প্যাঁপোর-পোঁ হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামীর বাচ্চা—গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাক্‌সিন বেরিয়েছে। তা এতদিন কী

করছিল মানুষ? হোআট বিজনেস? গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখো-শুখো দুটো হাত-পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে, নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব কটা হাত-পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকো। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্য সময় হলে গৌর অন্তত 'শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না. মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত-পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বেশী দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরী মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সওয়ারী এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গভির উত্তেজনায় বৌটা বাচ্চার ভ্যাক্‌সিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয় পাওয়া হাসি হেসে বলে—মাগো, কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখ!

লোকটা কাঠ-কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝট্‌কায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট্ পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে গাড়ি। ইঞ্জিন ধোঁয়ায়। গৌর দাঁতে দাঁত চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দান-মুখো। গৌর ভ্রূক্ষেপ

করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট্ সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সওয়ারীরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে। গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনো দশ মিনিট বাকী, গৌর গাড়িখানা পি. জি.র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোর গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে। চারটে বাজলে দাশ কেবিন। দক্ষিণের সওয়ারী পেলে ভাল। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ-মুখো দাঁড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাইয়ার হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম্ করে বেজে ওঠে। মাইরি! একী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে তবে মাগীটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাট্টা করে ছেড়ে দেয়। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনো চিন্তা করে নি গৌর। না রাখোহরির কথা না তার বাপ বগ্‌লুর কথা। তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কার্নিক মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝল্‌সানো

হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম্ মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধা-জাগা অবস্থায় বড় করে শ্বাস ফেলে। মাগীটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ—গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড হয় পুরো মানুষ নিত, নয়তো নিত হাত-পা-চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল। সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগীটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডটা যদি তার হাত-পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফাল্‌তু হাত-পা দেখিয়ে দিত গৌর, বলত—এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝম্‌ঝম্ পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা-বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙীন বাচ্চারা। খুব ভিড়। পোলিওর ভ্যাক্‌সিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মার হাত থেকে ছুটে ঐ কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনোখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝম্‌ঝম্ শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আশ জড়ানো। পিছনের কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতী মেয়ের মুখ জ্বল্‌জ্বল্ করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারী হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দুখানা তাই বোধহয় অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুলোটে কাচের ওপারে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপর একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদীর নকশা দেখে।

—কী চাই ? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক-পা দু-পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝম্‌ঝম্‌।

—গাড়ি জায়েগী ?

—কঁহা ?

—পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

—কিরায়া কৌন দেগা ?

মেয়েটা হাত তুলে দাঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল—উও। ভঙ্গীটা বড় ভাল লাগে গৌরের।

গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা-পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতী লোক বসে বুড়ির মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপ্‌টা দিচ্ছে।

—কী হয়েছে ?

—বড্ডী গরম ছে, দাঁতী লাগী।

—ও তোমার কে হয় ?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে—শাস্‌।

—আর ঐ লোকটা ?

তেমনি উদাস মুখে মেয়েটা বলে—আদমী।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল হাতে মেহেদীর রঙ, তবু তার কোথায় যেন রঙহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি, রুপোর গয়না, তবু হাত দুখানা বড় উদ্দেশ্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা—তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের ক্ষেতে গোধূলির নির্জন উদাসীন বৈরগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে—এখানে মরতে কী করছিলে ?

মেয়েলী হিন্দিতে মেয়েটি বলে—ক্ষেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের ক্ষেতীও ছিল ছোটো। আদমীটা বাজী দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজী দেখাই। আমার আদমী লাঠি ঘোরায়, চারটে ছোরা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁটমাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়—কত কী করে!

—আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে—আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে ঝম্‌ঝম্ করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর—অর্থাৎ বগ্‌লুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখাবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারে এখন এক দাঁতি-লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে—নেবো, নিয়ে এসো।

—কত নেবে?

—মিটারে যা ওঠে। বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোটো করে বলে—আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিও।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতী উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে—কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিও।

বালা-পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না।

মেয়েটা ঝুঁকে বলে—একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি, কাটারি ওঠে ল্যাণ্ডমাস্টারের লাগেজ বুটে। ততক্ষণে মেয়েটার নাকের নিচে নিটোল ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে জব্‌জবে ঘাম, পাগড়ী শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সীটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দুখানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফ্‌টি পারসেন্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যাণ্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শীগগীর পৌঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পৌঁছায় না। ময়দানের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়ে চড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছো? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে—সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

—তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে—সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে—চোপ্‌। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে—আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

—নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাবো।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে
—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

গৌর বিনীত স্বরে বলে—পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না কিংবা মারো লাঠি। পুলিসও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝক্‌ঝকে সরল দাঁত সে কারো দেখে নি।

দেহাতী লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশীদূর নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘুণচক্করে ঘুরে খানিক মিটার ওঠাবে মাত্র। দেহাতী বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা আর মাথায় এক বেহদ্দর মাগীর পাগল নাচ নিয়ে গৌর কোনো শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায়, ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ্য করে নি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয় তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যাণ্ডমাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে-জায়গায় টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নায় চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ী আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোটো করে জিব্‌ বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছে তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার

বিরক্ত হয়ে ভীতু গলায় বলে—একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মার শরীর ভাল না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পীড কমায়, আবার বাড়ায়। ক্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যাণ্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ী একটি দেহাতী মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে পারে!

ল্যাণ্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যেই কোণে বসে আছে সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যাণ্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালী চুমকির পিছনে তার মুখ। চকমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেইদিনই ল্যাণ্ডমাস্টারটার দশ পারসেণ্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতার সুবাস-ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে-ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যাণ্ডমাস্টারের গদীর গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড়টাকার মতো বেশী উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙীন বলগুলো ওড়ে

কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দে গোলা ছোঁড়ে শূন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢাকা মুখে আবার জিব ভেঙায়। তার খাঁদা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। দেহাতী শরীরের কাঁচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ-মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব ল্যাণ্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকোনা বাতাসকে টৈটম্বুর করে দেয়। গৌর শ্বাস টানে। তবু সওয়ারী খালাস দিতে হবে বগলুর তিননম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দুখানা রুখো-শুখো হাত-পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যাণ্ডমাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তনশীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার কামান কোন দূর থেকে ঠিক রঙীন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহর বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিস হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলায় বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

গৌর শেক্সপীয়ার সরণী পেয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ-ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বেণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ির জোর টানে ল্যাণ্ডমাস্টারের গভীর গদীর মধ্যে দেহাতীরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক-সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে। আবার

ভুলে যায় গৌর। আবার মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতী মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিওন সাইন দপ্‌দপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ নিওন সাইন্ দপ্ করে জ্বলে উঠে বলে—তুমি···তুমি···চাও···চাও···লায়লার···লায়লার ···রুটি···রুটি···। আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমক্ষেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যাণ্ডমাস্টারের সামনে পার্ক স্ট্রীট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যাণ্ডমাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল জাহাজের ভোঁ-ও-ও-ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যাণ্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এক বিদেশী বন্দরে আঙুরের লতায় ছায়ায় থোপা থোপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্টো বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া ল্যাণ্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভোঁ দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিমন্ত্রণ। গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে, ঐ হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ঐ টিলার ওপরকার রঙীন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে

—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···। কী যে চায় গৌর তা ঠিক-ঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায় একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যাণ্ডমাস্টার—জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে। আঙুর ফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি, রঙীন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে—এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে—তুমি চাও···তুমি চাও··· তুমি চাও···

আই। আলবৎ গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিক ঠিকানা নেই। এক একদিন তার মৌতাত জমে উঠলে ল্যাণ্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জাঙ্গাল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে তা ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো যাবে, কোনো ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নিচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের ক্ষেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূর বিদেশী বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙীন ফুলে-ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনো। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যাণ্ডমাস্টার, ল্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, কলকাতার সঙ্গে সেঁটে গেছে বগ্‌লুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ্! আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যাণ্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিলে বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। এক ঝট্‌কায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায়। পিছন থেকে দেহাতী লোকটা চেঁচায়—রোখ্‌কে রোখ্‌কে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতীরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে—কিৎনা ?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠেছে। যখনই মৌতাতের সময়ে এরকম অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

—পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে, এই রুখো-শুখো হাত-পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়। আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতী। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতীর কাঁধে একটা ভাগলপুরী চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাকে দেখে নেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুণ রোদে নাচতে নাচতে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো, কতকাল সে গেহুঁর ক্ষেতী দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কতকাল নিজের আনন্দে নাচে নি সে! গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছাড়ে। দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সীটে একটা রঙীন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনো সওয়ারীর গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপ্‌টা। গৌর টেরও পাবে না।

তিন

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয় নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দুখানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জম্‌জম্ করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময়ে আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙা-চোরা দু'একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, ছেঁড়া বই-কাগজ, সংসারের জমে-ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে, বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখলে নিয়েছে রাখোহরি। এই হাফ-ফিনিশ বাড়িটার ওপর দাবি-দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবে না। কিন্তু কেবলই একটা আশা নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না। রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? যদি সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরোনো ব্যাটারী, পুরোনো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দুখানা সস্তা বেতের চেয়ার, দু-একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ক্যান, দু-একটা থালা-বাসন। ব্যাস আর কিছু নেই। ঘর দুখানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা

নন্দীরা সীমানা-দেয়াল দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখোহরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক আধদিন কুঁচো নিম্‌কি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। ডাঁটো শরীরের মেয়ে, দুবার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিম্‌কি! এসব গৌরের সামনে রেখে নন্দীরা তার নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেয়ালের জন্য সুতো ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল—দেখ তো, ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাকগে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেক। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোন মতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিঁপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কচিকণ্ঠি জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায় নি। গরু ঢুকে আগাছা খায় মট্‌মট্‌ করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দূরে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রঙচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুকসমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাঙ গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারী পুকুর। অনেক রাতে পুকুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে। দেশ-গাঁয়ের শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝাঁক পিন্‌ পিন্‌ করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যাণ্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়াল ঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম, গ্যারেজে খুটখাট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা দেখে

আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ল্যাণ্ডুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

কদিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তায় ঘাটে এখনো হাঁটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করে নি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠেছে একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে। জামরুল গাছে এবার ফল আসে নি। খুব পিঁপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাঁস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুঁটি ধরে পিঠে চাপে। একটা মাদী হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তল-তলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে, একটা হাঁস সেটা কপ্‌কপ্‌ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসেছে গৌর। কলকাতার একখানা স্ট্রীট ডাইরেক্টরীই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপয়ছান এখনো তার শেষ হয় নি। কবে হবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভাল ঘরখানা! তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের লোকদের সাথে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন—এরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তাঁর। তাই এই বাড়িটা করে এক গরীব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল—যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তার পাঁচ ছেলেমেয়ে, বৌ, বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিওন। কী ভাগ্যে তার

বৌটা হল সুন্দরী। সেই বৌই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার। বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোতো, একটু বেশী রাতে ফিরে আসত আবার। ঘরের বৌয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা—সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক ছোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনো মুখের বঁড়শি ছাড়াতে পারে নি। চলে আসত রবিবারে রবিবারে। হাতে মাছ, মিষ্টি দৈয়ের হাঁড়ি, বৌটি তাকেও খুশী রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বৌটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্র্যাণ্ড পাল্টে ফেলল। কিন্তু পাড়ায় তখন তার বৌয়ের নামে চিচিক্কার। কত লোক যে তাকে দামী গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ্য করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পৌঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বৌয়ের পা টলমল করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সে সব শুনে ভারী বিরক্ত হয়ে বলত—রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ঐ বৌয়ের খপ্পরে পড়ে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা মাঝে মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত—কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলো তো! তুমি সত্যিই কিছু করো-টরো না তো? বৌ কেঁদে বলত—ওমা! তাই কি পারি! নিতাই বলত—আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি ওসব করো না! বৌ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত—তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে কদিন নিতাইয়ের বৌ বেরোতো না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোতো, ফিরত রাত নিশুতির সময়ে। আবার তার বিয়ের আগের ছোকরা প্রেমিক রোববার দৈ, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষো শুনে ডেকে পাঠালেন—এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন—ওরকম বৌ

হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচ-জন পাঁচ কথা বলেছে। ঐ বৌ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ী লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠতেন—তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবী পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নতি হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকা পয়সা কোন গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরো দুই ছেলে মাধু আর সতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, চুরি চামারি দিয়ে বাল্য-জীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। বাড়ির বৌয়ের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে চারকাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেন নি, সুতরাং জমি তার নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতিভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চান নি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখে দিয়ে বললেন—বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান। নিতাইয়ের পকেটে বিস্তর নম্বরী নোট। তার আহুরী বৌ বাড়িতে পাকা বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিয়ে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে, খি

বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপরি আসত। হঠাৎ সে সব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষ-পার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়লেন—দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না। বগলাপতি শ্বাস ফেললেন। মানুষটা বিষয়ী বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন —আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাও নি, এখন আর যাবে কোথায়? ওখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা-নুলো ছেলে আছে, গৌরা। ওর যদি কোনো চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিও। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন—দাদা, আমরা মা-বাপ হয়েও ঐ বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছি, তো তোমার গৌরা! আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল, কেউ ফিরেও দেখে নি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখে নি। বড়বৌমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা। কুকুর বেড়ালটা যে এঁটো-কাঁটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ঐভাবে একরকম হাত ছাড়াই হয়ে গিয়েছিল। বগলা-পতি আর উকিল-মোক্তার করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না-হক-এর জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাকে ডিক্রী দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। রিফিউজিদের

জমির মায়া বড় বেশী। কলোনী থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেন নি। উপরন্তু তিনি পুরোনো আমলের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তাঁর ভাল লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময়ে ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফাঁক ফোঁকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন। আবার ধৈর্য ধরে সেই সব ক্ষয়পূরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তার স্বভাব। যার কাছ থেকে কাজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তাঁর সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানীকে তার বৌয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানী ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনো বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারী অফিসের পিওন বা আর্দালীরও বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন—এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়োবয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমিটা নিয়ে কথা উঠতেই বগলাপতি বললেন—ওটা ছেড়ে দাও। জবরদখল জমি, ওটা বিক্রিও করা যাবে না, আমরা থাকবোও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল—জমির জন্য বলছি না।

সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তার জন্য কিছু করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন—ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুণ্ডা বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুঁসে উঠে বলে—আপনার ঐ রকম ছেড়ে-দাও ছেড়ে-দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন—কী করবি তুই। কী করতে চাস? রাখোহরি বলল—মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ঐ নীরেস চার সাড়ে চার কাঠার জন্য মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বরাবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেন নি।

কিন্তু রাখোহরি দাপের লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রী পেলেও উদ্বাস্তু কলোনী থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিস গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজ গাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোতো গৌর। দু চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেণ্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল—তুই ঘুরে-টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেংচে নেংচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর

থেকে দেখতে পেল ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরোনো আমলের গাড়ি—এখনকার মতো বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ছোটো ছোটো। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার কদিন পর সেন্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে দেখে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বৌ। পালে পার্বণে তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে। সেদিন আর নিতাইয়ের বৌ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা-ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে পড়া! বড় লজ্জা করেছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বৌকে দেখিয়ে বলল—দেখ, এখনো তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেতে চলে যেতে পারি। যদি বিয়ে করি তো বৌয়েরও ভিসা পেয়ে যাবো। তখন গৌর তার অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম-ঘাঁটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ-গেরস্ত বৌয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বৌটাকে। রাখোহরিরও ফোরসাইট ছিল। বুঝেছিল, এ মেয়েকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্পে সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বৌ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডার্স গ্রীনের শীতের রোদ, ট্রাফ্‌লগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখীন জঙ্গলে শিকার, গল্‌ফ লিঙ্কে ছুটির দুপুর, উইক এণ্ডে সমুদ্রের ধারের একশ মজা—সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার

আর নাচ। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী হ্রদের ধারে চেরী আর আপেলের ক্ষেত, ইটালীর জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়ানো। কলকাতার দয়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বৌয়ের বুকের ভিতরে ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সীটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ঐ সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবল বিদেশী রাস্তার দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বৌটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনোদিন পুরো মানুষ বলে ভাবে নি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্তকাল, হাওয়া-টাওয়াও ভালই দিচ্ছিল, দু চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো—সে সময়ে গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল রাখো-হরি নিতাইয়ের বৌকে বলছে—চলো আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি।

—সে কী? তা কী করে হবে? বৌটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে—আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাই-ভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দূরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট, ভিসা তা চাই। তাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রী করে আমি তোমাকে বৌ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বৌয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে—তারপর—

বৌটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নায় গৌর দেখে, নিতাইয়ের বৌয়ের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বৌটা। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল—কবে?

সাড়ে চারকাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে ধরল—দাদা, এ কী শুনছি?

—কী শুনছো?

—সে যে বড় পাপকথা! এ সব করবেন না, ভাল হবে না। আমি পুলিসে খবর দেবো।

—দাও। উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

—এ সব করবেন না। আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বৌ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে পরে আছে তারা, টেরিলিন টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যাণ্ড পাল্টেছে। বৌয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে বাচ্চা কাচ্চা হতে দেয় নি। এখনো কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বৌ। পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী? এমনটা তো কখনো ভাবে নি নিতাই!

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল—কী আর খারাপ কাজটা করছি! একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেবো।

—ও সব ব্লাফ্। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন আমি জানি।

—জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন?

কিন্তু নিতাই যে তা অনেক বুঝিয়েছে, এবং বৌ বুঝতে চায় নি

তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল—দাদা, দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

কদিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে-ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিস পড়ার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর একটু বুড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেণ্ট লাগিয়ে রঙ করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দুখানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছুই না। তবু গৌর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগ্‌লুর ফোরসাইট ছিল, রাখোহরিরও ছিল। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালীগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজে যাবে! তাই আগে থেকেই খালাস করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালীগঞ্জে। জঙ্গুলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে একা পড়ে আছে গৌর! মাঝে মাঝে সে ভাবে, বোধহয় বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এইসব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু-একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হাল্কা মিহি নরম কী যেন

সব পড়ে আছে বাড়িটাতে। হাওয়া দিলে সেগুলো উড়ে উড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক একদিন দেখে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হাল্কা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে, উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেইখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা বাসনার ছাপ, ইচ্ছা অনিচ্ছা থেকে যায়। সে সবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইঁট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বৌ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্রলোক, রাখোহরির ছেলে বৌ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁশের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাঁধে বা মাথায় বসে ডানা কাঁপায়।

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলেছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে। এই যে এখন দিন দুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় চেয়ার টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি। জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পল্‌কা জিনিস দিয়ে তৈরি। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে, টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কব্জায়। আরও আছে রাখো-হরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারি নেমে

আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরিজি প্রার্থনা সংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকনার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখ পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তার। ধর্মসংগীত ছিল তার প্রাণ। যীশুর ক্রুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। যীশুর পুনরুত্থানের দিন তার গলায় রৌদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই সুখ তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাই-ফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে শিয়রের কাছে বুড়ো-সুড়ো সান্তা ক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামী দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন ভ্রূর নিচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ। সেই জলের নিচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপ কাঁটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিঁড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স—'অ্যাও, কাঁডে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভান্স। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোষাক, গম্ভীর মুখ সকলের। শব বহনকারী গাড়ির পিছনে সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবরা কাঁদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল—গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট

বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে, ঝুরঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে তখনো ফাদারেরা কেউ কাঁদে নি। সাহেবরা কাঁদে না—গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে, একটা ভয়-পাওয়া ছোট্ট ব্যাঙ লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাঙটা প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে। সেইসময়ে গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দুহাত বাড়িয়ে ব্যাঙটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপর, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তাঁর বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ঐ ছবিটা রয়ে গেছে—ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাঙকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়েছিল। তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের তেলোয় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাঙ প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখেছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো ওড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনো তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুখানা বিস্কুট।

—কী খবর? গৌর আল্‌গাভাবে জিজ্ঞেস করে। মেয়েটার গড়ন বেশ। বয়সকালের লক্‌লকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল—গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

—বেরোবো।

—কখন?

—এই তো। বেরোলেই হয়।

—আমি আর মা একটু কালীঘাট যাবো। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে—কালীঘাটে গিয়ে কী হবে?

মেয়েটা বলে—মা পুজো দেবে। মানত আছে।

—ও। আচ্ছা, নিয়ে যাবো।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে—জিজ্ঞেস করলেন না কিসের মানত?

—কিসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থম্‌থমে করে বলে—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো, তাই।

—ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থম্‌থমে মুখেই বলে—সব কি বলতে আছে?

—কেন, বলতে নেই কেন?

—ভাঙ্‌চি দেন যদি!

—ভাঙচি দেবো? কেন?

—অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে

ডুবে ছিল সে, ছুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক দেখছিল। সেই ডুবজল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পাল্টে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ্য করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে—ভাঙ্‌চি দেবো না।

এই মেয়েটাকে দিয়েই চা আর কুঁচো নিম্‌কি পাঠিয়ে গৌরের একহাত জমি এনক্রোচ করেছিল নন্দীরা। গৌরের সেইকথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুঁচো নিম্‌কি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েকপলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির একহাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত—কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের—ফিফ্‌টি পার্সেন্ট হাফ-ফিনিশ—বগ্‌লুর তিন নম্বরের ল্যাণ্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে-বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে—আপনি আমার বিয়েতে ভাঙ্‌চি দিলে আমি খুশী হতাম।

—অ্যাঁ! গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেইখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সেই শূন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা

করে খুব। পিস্টন রিং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর। জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানালার শিক বাইছে। গৌর জানালায় দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঐ দূরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ঐখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে ওড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো হাত-আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড়ে একখানা মুখ। রুখো-শুখো দুখানা হাত-পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কব্জায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি গৌর ঠেকাতে পারবে না। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাঙ্‌চি দিলে মেয়েটা খুশী হয়! আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানালা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখে নি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাঙ্‌চি দিলেই খুশী হয়? না কি যে কেউ ভাঙ্‌চি দিলেই খুশী হয়। কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা—'আপনি' না 'ভাঙ্‌চি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিঁপড়েরা

দেয়ালে বায়, কেন্নো আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিকে বেয়ে বেয়ে ওঠে। ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরো সময় লাগবে। কত সময় তা ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা জীবন এখনো পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে সঁবরে বসে ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়। গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুর্গী যেমন ডাকে।

চার

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরিই। বৌবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধে গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টৈ-টুম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উঁকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসীতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক টিপ দিতে হল আত্মীয়-স্বজনদের যে যার ডেরায় পৌঁছে দিতে। দু খিলি পান গ্রাভ্স্ চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের

ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আসে। শব্দ আসে। ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাঙ্চি দিলে খুশী হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম-ঘুম চোখে ভাবে। কথা কটা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থহীন ভালবাসার কথা তাকে কেউ কখনো বলে নি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুঁচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ঐ কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়, গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুঁচো নিমকি আর চাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে না। বিয়ের চিত্রিত পিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনো কিছু বলে নি গৌরকে আগে! বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। হাফ-ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুরো গড়া হয় নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কব্জায়, বাকী অর্ধেকে সে এক ঢুলঢুলে মিহিন বোঁটায় ঢুলছে। কখন ছিঁড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু ঐ কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনো ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ঐ কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান মানুষ চায় না। ওরকম দু'একটা রহস্য থেকে যাক। বাংলাদেশে

ঝড়তি পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যাণ্ডমাস্টার, সাড়ে চারকাঠা জমি, এখনো তুখানা ভাল হাত-পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনো মালা দেয়। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে-কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। তুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ-ফিনিশ গৌর তার ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের সীটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারী এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

কলকাতার সোয়ারীরা 'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারী থালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপে-জুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফাঁকা সীটখানা দেখা যায়। সেই সীটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনায় মেয়েটা আরো সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সরায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে—আরো সুন্দর হও, আরো আরো সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামী চামড়ায় তুর্লভ গোলাপী রঙ ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশী নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালী আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামী, চুলে মধুর মতো রঙ চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ······

ডেভবডিটা মাঝে মাঝে মচ্ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে

বলে—চোপ্। নো ইন্টারফিয়ারেন্স ইন্ লাভ্···নো ইন্টারফিয়ারেন্স ···বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উল্-এর বল গড়িয়ে যায় তেমনি নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি—বগ্লুর ব্যাটা—ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারীরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

—কোথায় যাবেন ? গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারীরা কত নাম বলে ! টেরিটিবাজার, হাটখোলা, মুর্গীহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যু-কূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ঐরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দুখানা মোটর সাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যাণ্ডমাস্টার তেমনি কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেইসময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুল-কুল করে বইতে থাকে। স্টীমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল জল-পুলিশ ট্রাফিক সামলায়। ঢাকার কামান দূর থেকে রঙীন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্ন-শিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাছি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন সেই বল—ফ্যাস্··ফ্যাস্ দি বল গৌর···গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিস কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দুখানা ক্রস করা। সেন্ট্রাল অ্যাভে-নিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো তখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিওন সাইন দপ্ দপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিওন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা কটা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফাস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর— ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূর যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ হতে থাকবে। ফুরোবে না।

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইণ্ডস্ক্রীনে! বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের মায়াময় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভ্‌স্ চেম্বার থেকে পুরোনো লটারীর টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলে নি, তবু টিকিটটা ছেঁড়ে নি সে, রেখে দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ! টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

থুনথুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের

কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো লোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাগরা দুলিয়ে গোলাপী রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমক্ষেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায়। পায়ের বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাঁপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোঁতা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নিচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফিন্‌ফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে। তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতী যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজীর ছোরা বের করবে, দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ড হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে জনের কাছে যাবে মাঙতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকানো। পুরুষটা তার বাজী শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম্ করে এক পা ফেলে, আবার ঝম্ করে অন্য পা। জনে জনের কাছে ঘুরতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকেও হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে, সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে

সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি-চিনি করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন এক-মনে বাজী দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন্ বন্ করে ঘোরায়। গৌর আস্তে জিজ্ঞেস করে—কী খবর?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে—ভাল। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন?

—এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসবো।

—আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে—আবার যখন আসবো তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক্ তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে—কাল—কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

—কী আছে দেশে?

—কিছু নেই তেমন। গাঁছ আর ধানের ক্ষেত, জল, মাটি, আর কী? শীতের শেষে আবার আমরা আসবো। তুমি বড় ভাল লোক—

গৌর হাসে। মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম্ শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত

পুরুষের সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদীর নকশা, উল্কি, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তার ল্যাণ্ডমাস্টারে বসে।

স্থলের গাড়ি জলে ভাষায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়। তার সেই আশ্চর্য জাতুর খেলা কেউ লক্ষ্য করে কিনা কে জানে! জল স্থলে অন্তরীক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যাণ্ডমাস্টার। কখনো কখনো তার পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূর জাহাজ-ঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিস্‌ফাস্ করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায় গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে! সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরোনো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোঁজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই, হাঁ হাঁ বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কষ্টের শ্বাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষ্যে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন—তুমি চাও···তুমি চাও··· তুমি চাও···লায়লার রুটি। কোথাও পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে স্যুর ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যাণ্ডমাস্টার। উইণ্ডস্ক্রীনে বিদেশী শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে-যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যাণ্ড-মাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মতো ডানা কাঁপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় পুলিস। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এস্‌প্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

—মামু, কী খবর? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে—ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রঙ জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা মুড়মুড়ে হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও।

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যাণ্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজর অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যাণ্ডু, আমরা দুজনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি!

বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালী চৈতলপাড়ার সোয়ারী ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।

—কোথায় যাবেন?

—কলেজ স্ট্রীট যাবো বাবা, নিয়ে যাবে?

পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদী সিঁদুর দগ্‌দগ্‌ করছে। উপোসী মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দুখানায়

ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসী।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা-চেনা লাগে তার। ঐ সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশী বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিঁদুর, উপবাস—সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।

কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তোলে মেয়েমানুষটা। কী সুন্দর আঙুল! লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ। চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি—যেন বা পিয়ানোর রীডে—সুন্দর আল্‌গোছে নড়ে। আর তখন একটা আঙটির হীরে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।

সেই হীরের ঝলক্‌ই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে। মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। একপলক ঘাড় ঘোরায় গৌর। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রঙ ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেল পাতার গন্ধ। এ কীরকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে—এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে—গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রঙ-ধুয়ে-ফেলা মতিয়া—তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেতপদ্মের মতো কপালে নড়ে, হীরেটা ঝিকোয়।

সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে—বাবা, তুমি ঐ মন্দিরে কখনো গেছ?

—না।

—একবার যেও। বড় ভাল লাগবে।

—আচ্ছা।

—ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠাণ্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনো ছড়িয়ে আছে ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেও বাবা।

চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফোঁটাগুলি পড়ে। সেই অশ্রুর চিহ্ন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।

গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রীট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।

ভ্রূ দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?

গৌর একটু হাসে।

মতিয়া লাজুক গলায় বলে—তাহলে আমাকে তুমি চেনো!

গৌর উত্তর দেয় না।

মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে—আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী।

মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।

—আসি বাবা। তুমি বড় ভাল লোক। মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত পয়সা গুণে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়। স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শূন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিক্‌লির নকশা। কলকাতার নিওন সাইনগুলিতে কত পুরোনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

পাঁচ

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণ-মুখো করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শো ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারী পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছম্‌ছম করে গৌরের। ঐ ডেড্‌বডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে টিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারী তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষা করছে গৌর! তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস্‌ হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো-শুখো তুখানা হাত-পাওলা তুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌরা যেমন কারো সার্ভেন্ট না তেমনি না পয়সারও স্লেভ। কেবল এক আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যাণ্ডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেড্‌বডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে! একটু সাবধান থাকা ভাল। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো চৌদ্দ বছরের হাফ্‌প্যান্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে দেখছে। মুখখানা শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গৌরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গৌর কারো সার্ভেন্ট নয়। আসুক. যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারী না হলে নেবে না। গৌরহরি অর্থাৎ বগ্‌লুর ছাওয়াল গৌরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

—ট্যাক্সি যাবে ?

—কোনদিকে ?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে—সাউথে।

—আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয়তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল—ওদিকেই।

—তবে উঠে পড়ো। গৌরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে—ঐ গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারী। নাইট শো ভাঙতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া যায় মন্দ কী ?

—গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো। ঘষা-ফষা লাগে যদি ?

—লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গৌরহরি। ছেলেটা পিছনের সীট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে—আর একটু এগিয়ে।

—কতদূর ?

—এই সামনেই—কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গৌরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে এগোয়। বলে—গাড়ি ঘোরাবো কী করে ? ওদিকে বেরোবার রাস্তা আছে ?

—আছে। কোনো অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গৌরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকা বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

—আর কতদূরে ?

—আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে—সেখানে।

—ইস্! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড-টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারো চাকর নয়! কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

—ওরে ব্বাস্। এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

—গাড়ি যায়।

—যায় যাক্। আমি যাব না। এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার লোকজন ডেকে আনো। এইটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে।

—এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও-প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে। চলুন না, মিটারের বেশী দেবো।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যাঁ! পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে। বগলাপতির আমলে পুরোনো ডজ গাড়িটার ছোটো আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরী নোটের ছবি দেখে নি।

—বেশী দিলেই কি! আমি যাবো না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

—যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

—না গেলে কী করবে?

ছেলেটা—বাচ্চা মিষ্টি চেহারায় ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল—চল্ শালা, ফের মুখ খুলেছিস্ কি ভোঁতা করে দেবো। ঢোক্ গলিতে—

গৌরহরি কোনোকালে মারপিট করে নি, মার খায়ও নি কখনো। বগলাপতি কচিৎ কখনো চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন তার বেশী কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি—টিকাটুলির বগলাপতির ছেলে গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌরা তার ভাল হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত

চেপে ধরল—খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়—

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দুজন ছায়ার মতো উট্‌কো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল—হুজ্জত করছে নাকি রে!

—একটু একটু—

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—জান্ নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেবো তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যাণ্ডমাস্টারখানা! বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ্ বগ্‌লুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা—যেটা কখনো তার প্রাইভেট কখনো বা পাবলিক! গৌর আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

—যাবে কি না।

দরগায় সিন্নি, গীর্জেয় মোমবাতি, বদর-বদর—যাবো বৈ কি! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌরা যাবে। যদিও বগ্‌লুর পোলা গৌরা কারো চাকর না—তবু ল্যাণ্ডমাস্টারখানা গেলে গৌরের আর থাকে কী। অ্যাঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখো-শুখো হাত-পা আর মগজের ঝম্‌ঝম্ শব্দ।

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—যাবো।

—গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন। তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

—আর কতটা পথ? গৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

—চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো ছাট্‌কা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরোনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়িঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ। তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা অন্ধকার, নিশ্চুপ। কথা না বলে গৌর এগোলো। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুট্‌কো ছাট্‌কা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল—এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগ্‌লুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কী! তার গাড়ির ডেড্‌বডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনো তেমন কোনো বিপদে ফেলে নি তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত! তা ছাড়া ডেড্‌-বডিটার আর কোনো নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেড্‌বডিটা অনেক ভাল! তাকে নিয়েই তো এতকাল ল্যাণ্ড-মাস্টারখানা দাব্‌ড়ে বেড়াচ্ছে বগ্‌লুর ছাওয়াল—

আরো তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছজন, গৌর বে-আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ্য করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকে ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সীটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দু'ধারের দুজন

সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সীটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল—চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জ্বেলো না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়াই। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনো রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখে নি।

—কোনদিকে যাবো?

—চলো সোজা। আমরা বলে দেবো।

পিছনের সীটে ডেড্‌বডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত-পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেড্‌বডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন-প্রাণ দিয়ে, তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যাণ্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

—আস্তে, বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি ধারে করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনোখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা লোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কোঁক করে হেঁচ্‌কি তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দটা করল। অনিচ্ছাতেও উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর

ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে গরম একটু কী যেন ছিট্‌কে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনোক্রমে টাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল—ব্যস্, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনোকালে আসে নি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুঁকে বলল—একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে দিও। পুলিসে যদি যাও—আমরা নম্বর টুকে রেখেছি—

বডি! গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল ল্যাণ্ডমাস্টারটায়। বগ্‌লুর দেওয়া গাড়িটাতে। ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

—কী হে, শুনতে পাচ্ছো, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

—যাও। লাইট না জ্বেলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাট রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগ্‌লুর পোলা গৌরা তার অদ্ভুত সোয়ারীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল পরা দুটি পা ঝম্‌ঝম্

শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি! কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগ্‌লুর ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যাণ্ডমাস্টারে ডেড্‌বডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওলায়? কোন অপরাধে হে বগ্‌লুর ছাওয়ালের—যার জন্য তার দুটো হাত-পা শুখো। আর মগজে ঐ বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি! কে জবাব দেবে?

পিছনের সীটে ডেড্‌বডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছন ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানালায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগ্‌লুর ছাওয়ালের ল্যাণ্ডমাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়ে চড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ল্যাণ্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির—অর্থাৎ কিনা বগ্‌লুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে যাচ্ছে: মাইরি, এ সব গাছপালা, রাস্তা, আলো এসব যে গৌরবাবু কখনো দেখে নি! সোয়ারী যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু আজকের সোয়ারী যে শালা কথাও বলে না! ভয় করে না নাকি বগ্‌লুর পোলার! অ্যাঁ! গৌরবাবুর কি ভয় করে না! কেন শালার ভয় দেখাও গৌরবাবুকে! কোন অন্যায় করেছে গৌরা? হ্যাঁ, সত্যি বটে মাঝে সাঝে সে সোয়ারী কাট্‌ মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয় নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল—অনেকদিন আগেকার কথা—গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে

গিয়েছিল। আর একবার দুটো কচি মেয়ে আর বৌ নিয়ে একটা মফঃস্বলী হাবা লোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে—হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম্ আর পুলিসের আওতায় যাওয়া—তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোক দেখানো জ্যাক্ লাগিয়ে ছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কচি মেয়ে আর বৌ নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরো অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারটার জন্য ঠেকে ছিল? যে যার গন্তব্যে পৌঁছায় নি কি শেষ পর্যন্ত? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী! তবে কেন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারে ডেড্‌বডি? বগ্‌লুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওয়ালা?

ডেড্‌বডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লট্‌পটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি? অ্যাঁ! উট্‌কো উঠে বসে আছো! কোথায়? কে হে—?

নিঃশব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল।

ডেড্‌বডিটা নিঃশব্দে বলল—আমি একজন—তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের কজনকে তুমি চেনো? তবে আমি—বুঝলে—আমি এই সংসারের ভাল চেয়েছিলুম। ঐটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখ গৌরবাবু, সংসারের ভালমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালমন্দেও হাত পড়বে। তবু এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখ না—আমার পেটটা—কেমন হাঁ হয়ে আছে! কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যাণ্ডমাস্টারের চমৎকার গদীতে শুয়েছি আরামে—আর

উঠবো না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালই। ঢুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে—বাইরে জ্যোৎস্না—মোলায়েম বাতাস বইছে—এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশী সুখ আর কিসে? চালাও গৌরবাবু, চালাও—থেমো না। আমরা দুজনে চলো, এই ল্যাণ্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই—চলো হে বগলুর পোলা--

তা গৌর তার উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি, ডেকে বলছে—হেই গৌরঅবি, ফ্যাস্—ফ্যাস্ দি বল্—

গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে কুয়াশার সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে বেঁকে আকাশ-মুখো উঠতে থাকে। গৌরহরি ল্যাণ্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শূন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডি সহ গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা পয়সার অঙ্ক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে—ভালবাসা···পরিপূর্ণতা··· ঈশ্বর···
